বাতায়ন
বাসন্তিক

জগৎ পারাবারের তীরে
শিশুরা করে খেলা

Batayan

বিংশ সংখ্যা

মার্চ, ২০২০

বাতায়ন

সম্পাদনা

রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়

Issue Number 20 : March, 2020

Editors

Ranjita Chattopadhyay, IL, USA
Jill Charles, IL, USA (English Section)
Manas Ghosh, Kolkata, India

Coordinator

Manas Ghosh, Kolkata, India
Snehasis Bhattacharjee, Kolkata, India

Networking & Communication

Biswajit Matilal, Kolkata, India

Design & Art Layout

Kajal & Subrata, Kolkata, India

Website Support

Susanta Nandi, India

Chief Editor & CEO

Anusri Banerjee
Perth, Western Australia
a_banerjee@iinet.net.au

Published By

BATAYAN INCORPORATED
Western Australia
Registered No. : A1022301D
E-mail: info@batayan.org
www.batayan.org

Photo Credit

Tirthankar Banerjee — **Front Cover**
Perth, Australia — Mila Mila Waterfalls in Cairns, Queensland

His interest in photography started in student days. Much later the long nights in the dark-room were replaced by hours behind the computer and focus shifted from Black & White to Colour. He likes to show the images as they are and does not approve of computer gimmickry. He loves nature – flowers, birds, trees and all things beautiful. Tirthankar is an engineer, specializing in Renewable Energy and lives and works in Perth, Western Australia.

Alpana Guha — **Inside Front Cover**
Sea Beach, Denmark, Western Australia

আলপনা গুহ – কলকাতার লেডি ব্রেবোর্ন কলেজের বাংলা অনার্সের স্নাতক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তুলনামূলক সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি, দিল্লির Alliance Francaise থেকে ফরাসি ভাষায় ডিপ্লোমা করেছেন । পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হোম পলিটিক্যাল বিভাগে বাংলা অনুবাদক হিসেবে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন । নানা দেশ বিদেশ ঘুরে বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ায় পার্থের বাসিন্দা, এখানেও তিনি বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে অনুবাদকের কাজ করছেন ।

Rikta Rudra — **Title Page**
Kookaburra in Backyard, Sydney

Rikta Rudra – Born in Madhya Pradesh – Jabalpur, living in Perth, Australia for the past 35 years. Her profession is a school teacher specialising in Early Childhood. She enjoys travelling, gardening and music – mostly Rabindra Sangeet.

Partha Pratim Ghosh — **Inside Back Cover**
International Women's Day Sketch – Ashroy

As a Civil Engineering Graduate from Bengal Engineering College, Shibpur and a Professional Engineer (PE) of Pennsylvania, USA. I practiced Engineering for 52 years in USA, Canada and in India. Moved back to Kolkata from USA in 1987. Pursuing Painting as a hobby very passionately and with dedication. Organizing exhibition of my artwork every year in January, since 2014.

Saumen Chattopadhyay — **Back Cover**
Sea Beach, Dominican Republic, Central America

Saumen Chattopadhyay — Saumen is an avid outdoor enthusiast and enjoys hiking, trekking, and photography. He also takes part in recitation, drama, mind science, Native American flute and Indian classical music. Saumen is an entrepreneur in the field of investment research and portfolio management. He lives in Chicago.

বাতায়ন পত্রিকা **BATAYAN INCORPORATED, Western Australia** দ্বারা প্রকাশিত ও সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত । প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া, এই পত্রিকায় প্রকাশিত যে কোন অংশের পুনর্মুদ্রণ বা যে কোন ভাবে ব্যবহার নিষিদ্ধ । রচনায় প্রকাশিত মতামত সম্পূর্ণ ভাবে রচয়িতায় সীমাবদ্ধ ।

Batayan magazine is published by **BATAYAN INCORPORATED, Western Australia**. No part of the articles in this issue can be re-printed without the prior approval of the publisher. The editors are not responsible for the contents of the articles in this issue. The opinions expressed in these articles are solely those of the contributors and are not representative of the Batayan Committee.

সম্পাদকীয়

"It was the best of times, it was the worst of times."

এখন সময় বসন্তকাল। মধুমাস। ফুল, নতুন পাতা, আর রঙের মাস। জীয়ন কাঠির স্পর্শে প্রকৃতির ঘুম ভাঙার সময়। মাটির শিরায় শিরায় প্রাণের হিল্লোল। আমার আশেপাশে জলাভূমিতে উড ডাকেরা ঘোরাঘুরি করছে। শীতঘুম থেকে জেগে উঠছে পশুপাখী। সকালে হাঁটতে বেরোলে পাখীদের কলকাকলী শুনতে পাই। দেখতে পাই শুকনো গাছের বুক চিরে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে নতুন ডালপালা। বেড়েছে দিনের দৈর্ঘ্য আর হাওয়ার উষ্ণতা। কিন্তু এ বসন্তের ক্যানভাসটি বেরঙা! প্রাণের সমারোহ কিছু ম্লান। রাস্তাঘাট প্রায় জনহীন। ছোট ছেলেমেয়েদের হট্টগোল তেমন কানে আসছে না। পাড়া (আমেরিকায় যাকে neighborhood বলে)-র মোড়ে চোখে পড়ে না তাদের জটলা। কদাচিৎ দু একজন পথচারীর সামনাসামনি হলে দুজনেই দূরত্ব বাড়িয়ে ফেলছি চটপট। কেমন যেন বেসুর বাজছে সবখানে।

সারা পৃথিবী জুড়ে এক বিচিত্র পরিস্থিতি এখন। একবিংশ শতাব্দী। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে উন্নতির শীর্ষে এই গ্রহ। তাও জীবন তোলপাড় এক আণুবীক্ষণিক জীবদেহের আক্রমণে। Covid 19-এই মুহূর্তে গুগলের সবথেকে বেশী খোঁজা শব্দ বোধহয়। Covid 19 সাধারণভাবে করোনা ভাইরাস নামে পরিচিত। এ ভাইরাসের কিছুই কিন্তু সাধারণ নয় এখন আর। এর প্রকোপ মহামারী রূপে দেখা দিয়েছে ইতালী থেকে ইরানে, মেলবোর্ন থেকে কলকাতায়। থমকে দাঁড়িয়েছে নিয়ত ছুটতে থাকা মানুষ। সংক্রমণ এড়াতে গৃহবন্দী অনেকে। এ পরিস্থিতি বাধ্যতামূলক। বন্ধ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন অফিস, লাইব্রেরি, জিম। দোকানপাটও বন্ধ হবে হবে করছে। আগের থেকে কম সময়ের জন্য খোলা থাকছে মল আর সুপার মার্কেট। চিকিৎসা বিজ্ঞানের এই অগ্রগতির যুগে মহামারী ? এও সম্ভব ? উদ্বেগ মেশান বিস্ময়ে সারা বিশ্ব তাকিয়ে আছে গবেষকদের দিকে – কখন আবিষ্কার হবে করোনা ভ্যাকসিন ?

"It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness, it was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity, it was the season of Light, it was the season of Darkness, it was the spring of hope, it was the winter of despair, we had everything before us, we had nothing before us, ..."

মহান ঔপন্যাসিক চার্লস ডিকেন্স তাঁর "A Tale Of Two Cities" উপন্যাসের শুরুতে ফরাসী বিপ্লবের সময়ের ফ্রান্স আর ইংলন্ডের কথা বলতে গিয়ে এই বিখ্যাত উক্তিটি করেছেন। নিজের সময়ের সঙ্গে তুলনা করেছেন চরম বৈপরীত্যময় সেই সময়ের। তাঁর দূরদর্শিতা ধার নিয়ে আজকের সময়টা যদি এক নিরপেক্ষ দর্শক হিসেবে দেখি তাহলে এ কথাটা মনে আসে বারবার। বলতে ইচ্ছে করে, "it is the best of times, it is the worst of times"। ভাইরাসের আক্রমণ আরো একবার চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল যে ভৌগোলিক সীমানা সত্যি কত কমজোরি। মেঘের মতো সেও কাঁটাতারের তোয়াক্কা করে না। আমরা হয় তো বড় বেশী গুরুত্ব দিয়ে ফেলছিলাম দেশ, জাতি, ধর্ম বা ভাষার গন্ডীকে। তাই চেতনার উন্মেষের জন্য একটা ধাক্কার প্রয়োজন ছিল। বিভেদ ভুলে সমগ্র মানবজাতির একজোট হয়ে লড়াই করার সময় আজ। সময়

পরস্পরের দিকে সাধ্যমতো সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার। একই গ্রহের কিছু মানুষ খারাপ থাকলে অন্যরা যে ভালো থাকতে পারে না এ সময় সেই সত্যিটা বেশ স্পষ্ট ফুটে উঠছে। ভালো থাকার এই সমষ্টিগত রূপটা পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার দরকার ছিল।

মারণ ভাইরাস মানবসমাজের আরো কিছু কিছু দিক তুলে ধরছে আমাদের চোখের সামনে। মহাবিশ্বের সৃষ্টিকালের বিস্ফোরণ থেকে পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব পর্যন্ত সময়কাল দেখলে দেখি মানুষ তুলনায় অল্পদিন হল এসেছে এই গ্রহে। সে সঙ্গে এনেছে তিনটি সহজাত উপহার-হাতের বিপরীতমুখী বুড়ো আঙ্গুল, চিন্তা করার বুদ্ধি আর ভালোবাসার ক্ষমতা। এই তিনটি উপহার তার ভুতের রাজার তিন বরের মতো। এদের সাহায্যে সে শ্রেষ্ঠ জীবের আসন অধিকার করেছে সহজে। কিন্তু চলার পথে দূরত্ব তৈরী হয়েছে অন্যান্য প্রজাতির প্রাণীকুলের সঙ্গে। নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের অহংকারে আমরা নিয়ত অগ্রাহ্য করে চলেছি গাছপালা ও অন্যান্য জীবজন্তুর অস্তিত্ব। কখনো বা সংকটের মুখে ঠেলে দিচ্ছি তাদের। একটাই গ্রহ যে আমরা সকলে ভাগ করে নিয়েছি এই বোধ চাপা পড়ে গেছে প্রায়। এই মহামারী কিছুটা তারই পরিণাম বলে মনে হয় যেন। আমাদের অস্তিত্ব অন্যান্য অনেকের অস্তিত্বের কাছে দায়বদ্ধ। সে দায়বদ্ধতা কতটা স্বীকার করতে পেরেছি আমরা সেটা ভেবে দেখার সময় এসেছে।

সময়চক্রের অমোঘ গতিতে এই মহামারী শান্ত হবে। কেটে যাবে দুর্যোগের কাল। ইতিহাস সে কথাই বলে। তবে মহামারী রেখে যাবে পরিবর্তনের ছাপ – সমাজে, রাজনীতিতে, অর্থনীতিতে, শিল্পে, সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে। যেমনটা আগেও হয়েছে। কেমন হবে সেই পরিবর্তিত মানবসমাজ ? পরমত সহিষ্ণু, উদার, ক্ষমাশীল, ঐক্যবদ্ধ ? এর উত্তর ভবিষ্যতের গর্ভে। আপাততঃ এই সময়ে দাঁড়িয়ে কি করণীয় ? ভাবনা চিন্তা আর নিজের মধ্যে ডুব দেওয়া ছাড়া আর বিশেষ কিছু করার উপায় নেই। অস্থির পরিস্থিতি সৃষ্টিশীল মানুষের সৃষ্টিশীলতা জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করে। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির জগতে এর বহু দৃষ্টান্ত আছে। আমাদের ভরসা ও আশা সেখানেই। রাত্রির তপস্যা শুভদিন আনবেই।

বিশ্বজোড়া এই অনিশ্চয়তার মধ্যেও ঋতুচক্রের ছন্দ স্থির। হৃদয়ের কেন্দ্রে কিছু মূল্যবোধ, কিছু ভাবনা আঁকড়ে এ 'মারের সাগর' পার হওয়া সম্ভব। বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতা নয়, এখন সময় এক সূত্রে সহস্র জীবন বেঁধে ফেলার। এরকম সূত্র শিল্প সাহিত্য ছাড়া আর কিই বা হতে পারে ? গল্প ভৌগোলিক সীমা পার হয়ে পৌঁছে যায় দেশ থেকে দেশান্তরে। স্থান কালের দূরত্ব নিমেষে মুছে ফেলতে পারে কবিতা, নাটক, গান বা ছবি। পরস্পরকে না চিনেও তৈরী হয় একাত্মতা। বাতায়ন পত্রিকা এই একাত্মতা তৈরীর এক উদ্যোগ। উদ্বেগ ও ভাবনার মুহূর্তে আপনাদের জন্য রইল বাসন্তিক বাতায়ন। নানা স্বাদের গল্প আর কবিতায় সাজান। প্রেম, ভালবাসা আর আবীর ছাড়া বসন্ত হয় কি করে ? তাই বাতায়নের এ সংখ্যায় প্রেমের কবিতা আছে কিছু। আছে এমন কিছু লেখা যেখানে প্রতিফলিত এই সময়। আছে দুটি প্রবন্ধ ও একটি ভ্রমণকাহিনী। নবনীতা দেবসেনের প্রতি একটি বিশেষ শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রকাশিত হলো এবারে। বাতায়ন রইলো, সঙ্গে রইলো অজস্র শুভকামনা। যে যেখানে আছেন ভালো থাকুন। সুস্থ থাকুন। ভালো থাকার ও ভালো রাখার এই লড়াইতে সকলের সহযোগিতা চেয়ে নিলাম।

আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসাসহ,

রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদিকা, বাংলা বিভাগ

সূচীপত্র

বাতায়ন

কবিতা

সঞ্জয় চক্রবর্তী
বসন্তখাম 7
দোল 7

উদ্দালক ভরদ্বাজ
ছিন্ন ভাবনা 8
রিনির ডায়েরি 8

দেব বন্দ্যোপাধ্যায়
আবর্ত 9

শুভ্র দাস
আমার কৈফিয়ত 10

সুজয় দত্ত
কবিতার আসাযাওয়া 12

ধীমান চক্রবর্তী
দেশ 13

মানস ঘোষ
ফেসবুক 14
দাবানল 14

জয়ন্তী বন্দ্যোপাধ্যায়
অসম্ভব 15

সৌমিত্র চক্রবর্তী
সুখোসুখি দুখোদুখি
বহুদিন পর মুখোমুখি 16

স্নেহাশিস ভট্টাচার্য
অগোচর 17

স্নিগ্ধা সেন
বালান্টির বেলুন 18

তৃপ্তি বন্দ্যোপাধ্যায়
অনন্যা 19

পারিজাত ব্যানার্জী
দেশনায়কের প্রেম বনাম যুদ্ধ নামের রোগ 20
বন্দিনী রাজনন্দিনী অসহায় শেষ স্তবক 20

সৌমিক ঘোষ
জলের উপর জল বয়ে যায় 21

তাপস রায়
পসারীনি 22

গল্প

সৌমিত্র চক্রবর্তী
কবিতার চরে একা ৩৯

তপনজ্যোতি মিত্র
আকাশকুসুমের পৃথিবী 40

ইন্দ্রাণী দত্ত
বৌঠানের ছাদ 43

দেবশ্রী মিত্র
সেফ্ রাইড 49

সুজয় দত্ত
লেবু 51

শ্রাবনী রায় আকিলা
ডিপ্রেশন 56

অনুগল্প সংগ্রহ

বিশ্বদীপ চক্রবর্তী
অনাহূত 34
ডিনার সেটিং 35
বিদ্যাসাগরের মাথা 36

বইয়ের আলোচনা

অর্পিতা চ্যাটার্জী
স্ব-অধীনা 29

স্মৃতিচারণ, প্রবন্ধ ও অভিজ্ঞতা

রজতশুভ্র মজুমদার
মৃত্যুর পরের দিন লেখা একটি ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ 23

দেবীপ্রিয়া রায়
বসন্ত এসে গেছে 25

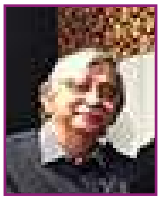

সিদ্ধার্থ দে
বইমেলা ২০২০ 59

সঞ্জয় চক্রবর্তী

বসন্তখাম

হুকুম নামাও, আঁচল তোমার
নীল ভরে দি ... মেঘ আনতাম,
পাঠায় চিঠি কৃষ্ণচূড়া,
গন্ধে মোড়া বসন্তখাম ।

সেই খামে থাক ডাকটিকিটে,
জলছাপে নাম সব দিনের,
তোমার আমার, গুলমোহরের,
রঞ্জন এবং নন্দিনীর ।

আজ বসন্তে আনমনা মন
অল্প কেমন টসরমনা,
রাঙ্গুক দু গাল আবির তোমায়,
আর না বললে তো চলবেনা ।

কুমকুমে ছাপ ঘাসের বুকে,
এই বুকে ছাপ থাকবে না কি ?
আগুন তোমার ছড়াক শিমূল,
যাজ্ঞসেনা আজ্ঞাবাহী ।

পেশম ছোঁয়া আঁচল মাতাল
উথাল পাতাল, ঠোঁট ভিজিয়ে
ফির লে আয়া দিল মুসাফির
মেহফিল মে ক্যা কিজিয়ে ... ?

ভরিয়ে সিঁথি সিঁদুরপলাশ
ফাগুন নেশা ছড়িয়ে দিয়ো,
সেই নেশাতে ডুববো, না হয়
এই বসন্তে বাঞ্ছনীয় ।

দোল

ফাগের বাতাস ভিজতে পারে
হলুদ, সবুজ রঙবাহারি,
দু চারটে রঙ সাজিয়ে নেবে
গুলাল, আবির ও পিচকিরি।

হিমঝুরি আর রুদ্রপলাশ,
আগুন রঙে ফাগুন দিলে,
ভিজতে পারে দুরের আকাশ
রঙ মাখানো এক বিকেলে।

বাসন্তীরঙ ফাগ ছেয়ে যাক
কৃষ্ণচূড়া, শিমুলদলে,
ছিটকে লাগুক দু চার কুচি
পাঞ্জাবি আর তোমার গালে।

আজ বসন্ত রঙ ঢেলে দিক
নইলে দোলের কিইবা মানে,
আবির গুলাল সাক্ষী থাকুক
পথ চিনে নিক প্রেমিকজনে।

সঞ্জয় চক্রবর্তী – অধুনা সিডনী নিবাসী । পেশায় সিভিল ইঞ্জিনিয়ার কিন্তু নেশায় আদ্যন্ত কবিতাপ্রেমিক । ছন্দ তার কবিতায় প্রাধান্য পেয়ে থাকে । ফেসবুকিয় জগতে অনেক দিন ধরে টুকিটাকি লেখার পর অবশেষে বাতায়নে আত্মপ্রকাশ । সঞ্জয়ের সব থেকে বড় দুর্বলতা হল মেঘ আর বৃষ্টি ।

উদ্দালক ভরদ্বাজ

ছিন্ন ভাবনা

১
ভরে যায় মৃৎপাত্র ভালবাসার
শুধু তোমার কথা ভাবলেই।

২
তোমার চলে-যাওয়া সময়ের ঘ্রাণ
আমি এখনো পাই, রোজ সন্ধ্যায়।

৩
বুকের মধ্যে আগুন জ্বলছে
মাতালের মত ইচ্ছা টলছে

৪
ভাল থেকো,
বন্ধু হয়ে, ভালবাসা হয়ে।

৫
ক্রমশ সত্যের দিকে যাওয়া
ক্রমশ তোমার মুখের দিকে চাওয়া।

৬
কেটে যায় সময়
নীরবের মোহানায়, রূপের রোদনে।

৭
কেন দিলে এই ভালবাসা কাণ্ড আমায় ?
আমাকেই কেন, ভেবে দেখেছ কখনো ?

৮
রাত্রির নিভৃত প্রতীক্ষার আড়ালে,
ঢলে-পড়া স্বল্পস্থায়ী ঘুম ...

৯
ভালবাসছি চলে যেতে
ভালবাসছি কাছে পেতে

১০
খুদ-খোঁটা চঞ্চলতায়
আবার নামব তার সনির্বন্ধ শরীরের ঘাসে।

রিনির ডায়েরি

একটা বুড়ো মানুষের মত মেঘ কাল ভেসে এলো
আমি তাকে জানলা খুলে ঘরে ডাকলাম
কি জানি কি ভেবে আদর করে দিলাম
ওর নরম তুলোর মত বুকে...
আমার আদরের তাপে, একটু একটু করে
সেই বুড়ো ঠাণ্ডা মেঘটা
গলে গলে পড়ল কাল সারা রাত
আমার চোখে, ঠোঁটে, নাভির নরমে ...

সকালে উঠে আর দেখতে পেলাম না ওকে
শুধু সকালের মিষ্টি রোদ উঠতে, দেখলাম
এক ফোঁটা চোখের জলের মত
এক বিন্দু শিশির
লেগে আছে আমার বাঁ পায়ের নখে
আমি তাকাতেই ঝিকমিক করে উঠল
ঝিকমিক করতে করতেই, হঠাৎ দেখলাম
নেই আর, উড়ে গেছে জলটা
মেঘটা ...

এম ডি এন্ডারসন ক্যান্সার সেন্টার-এ ক্যান্সার বিষয়ে গবেষণায় রত **উদ্দালক** অবসরে কবিতা পড়া, লেখা এবং অনুবাদ নিয়ে থাকতে ভালবাসেন। উদ্দালকের কবিতা এবং অনুবাদ, কলকাতা এবং আমেরিকার বিভিন্ন পত্রিকা যেমন প্রবাস বন্ধু, দুকূল, প্রথম আলো, ভাষাবন্ধন, অর্কিড, বাতায়ন ইত্যাদিতে ছাপা হয়েছে। কবিতার বিষয় মূলত প্রেম হলেও, জীবনের আরও নানান উপলব্ধির প্রতিক্রিয়ায়ও উদ্দালক প্রকাশ করে রাখেন তার অনুভব। কখনো তা কবিতা হয়, কখনো শুধুই স্বগতোক্তি। সম্প্রতি নিউ জার্সির আনন্দ মন্দির প্রদত্ত গায়ত্রী স্মৃতি পুরস্কারে সম্মানিত হন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত তার সাহিত্যকর্মের উৎকর্ষতার জন্যে। স্ত্রী নীতি ও পুত্র সায়ন-কে নিয়ে উদ্দালক টেক্সাসের হিউস্টন শহরে থাকেন।

দেব বন্দ্যোপাধ্যায় ও তনিমা বন্দ্যোপাধ্যায়

আবর্ত

বিকেল পৌনে পাচঁটায়
আমাদের পৌঁছানোর কথা ছিল,
দেরি হয়েছিল অনেক।
হন্তদন্ত হয়ে পৌঁছে দেখি
তেরছা ব্লাইন্ড গুলো বেয়ে
ফালিফালি রোদটা তখনও বইছে সারা ঘর জুড়ে,
দু ভাগে সাজানো চেয়ার, মাঝ দিয়ে প্রশস্ত হাঁটা পথ ।

ফুলহাতা জামা, হাঁটু মোজা, পরিপাটি ফ্রক
কেউ কেউ নীল রঙা ব্লেজার, প্রজাপতি টাই,
গুঞ্জন পেরিয়ে হেঁটে চলে খিলখিল ঘুনসুটি
বাঁধানো তারে সাজে সুর,
ছোটো ছোটো আঙ্গুল, বাজায় টুং টাং ...

নিভতে থাকা আলোয়
শান্তিতে ভরে আসে ঘর
চাকায় তেলের অভাব, স্মৃতিতে তরল ছাই
চেনাশোনা মুখ ছুঁয়ে চশমায় জমে মেঘ,
নলের অক্সিজেন শিরা বেয়ে
চামড়ার ভাঁজে ভাঁজে কঠিন অঙ্ক কসে ...

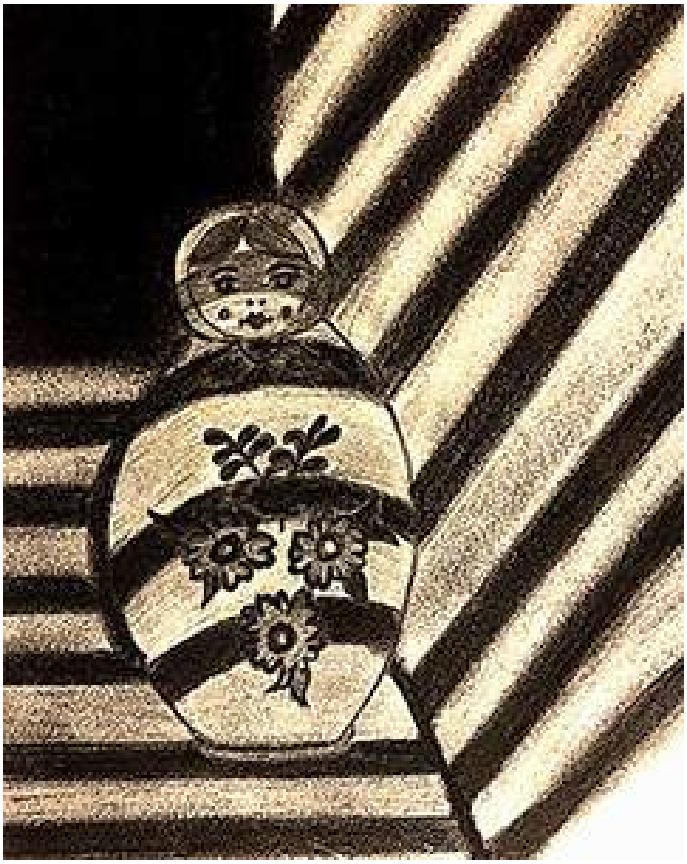

তনিমা বন্দ্যোপাধ্যায়

কিছু কিছু দিন শেষ হয়েও দিগন্তে রেখে যায় আস্বাদ
দীঘির জল আর আগলে রাখে না অস্থিরতা
কচিকাচাদের হাতে বেহালারা একসাথে কেঁদে ওঠে বৃদ্ধাশ্রমে..

দেব বন্দ্যোপাধ্যায় – পেশায় পদার্থবিদ্যার গবেশক, তবে যতটুকু সময়ের ফাঁকফোকর তাতে শুধু কবিতা নিয়ে ভাবনা চিন্তা আর সাহিত্যের ছাত্র হবার বাসনা । দেবের লেখা কিছু পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে । দেব সপরিবারে মিশিগানের বাসিন্দা ।

তনিমা বসু, পদার্থ বিদ্যায় স্নাতক । ইউনিভার্সিটি অফ মিশিগানের বায়োস্ট্যাটিস্টিক্সে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী সুযোগ করে দিয়েছে সংখ্যাতত্ত্ব ব্যবহার করে অন্তর্হিত সত্য উদ্‌ঘাটন করার । বিজ্ঞানের ছাত্রীর অবসর সময় কাটে কাগজে আকিঁবুকি করে, বিভিন্ন মিডিয়ামের সাথে পরিচিত হয়ে – কখনো কাগজে, কখনো স্ক্রিনে । ভালোবাসে ছবি তুলতে রঙীন প্রকৃতির এবং আপনজনদের । **প্রথম গল্প লেখা হাত** ।

শুভ্র দাস

আমার কৈফিয়ত

কাল রাতে ঘটে গেছে রক্তারক্তি অঘটন,
মেয়েকে সান্ত্বনা দিয়েছি তিন ঘন্টা;
চোখের জ্বালা, মনের জ্বালা, আর
নভেম্বরের এই ধূসর শীতল স্তম্ভিত ভোর, অসহ্য এখন সবই;
ভোরের ক্লাশের মেজাজ আজ স্তব্ধ দেশের প্রতিবিম্ব,
মাথায় হাত দিয়ে বসে সামনের সারির মেয়ে দুটো –

ক্যালকুলাসের খাতা সরিয়ে
ওরা মনের কথা বলে
সামনের সারির মেয়েটা সব কাজ ফেলে এক ঘন্টা দূরে বাড়ি গিয়ে ভোট দিয়েছে,
তবু হার; ভিক্টোরিয়া চেয়েছিলো মেয়ে প্রেসিডেন্ট হবে,
কিন্তু এরকমটা হবে ভাবে নি;
প্যাট্রিক ওহারা বলে মেয়ে প্রেসিডেন্ট হবার সময় এসেছে, কিন্তু এ মেয়ে সে মেয়ে নয়;
ডানদিকের একজন বলে সে খুশী, কিন্তু তার পাশের ছেলেটি নয়;
ওরা বার বার জানতে চায় আমি খুশী কিনা;
হতাশা, উচ্ছ্বাস, আশা, আর ভাষার স্বাধীনতায়
সাদারাই বাঙ্ময় আজ –

আর,
হিজাব মাথায় নূরান হাসান, যার
সারা সেমেস্টারে একটাও নম্বর কাটা যায় না;
বা চুলে যার ঝর্ণা ঝরা বেণী, কালো মেয়ে জেসমিন জেফারসন;
বা স্বপ্ন-দুঃস্বপ্নর মাঝে বেঁচে থাকা হাসিমুখের ড্রিমার, জনাথন গার্সিয়া;
বা যথার্থ বানসাল, যার বাবা-মা এক সুটকেস্ আশা নিয়ে সেই তিরিশ বছর আগে –
বা জনি উইদেরস্পুন, পরীক্ষার ঘরে যার মায়ের ভয়ার্ত ফোন আসে,
ব্যাঙ্ক পড়াশোনার খরচ দিতে নারাজ;
বা সামনের সারির লিন্ডা, যে একশো মিটার ছোটে;
বা কার্লোস আর কার্লোস – কেউ সাদা নয় এরা,
এরা সম্ভাবনা, মূক, নিথর;

সাদা নয়, তাই এরা কেউ আমায় দেখে না;
সাদা নয়, তাই দুঃখ, স্বপ্ন, আর অজানা আতঙ্কের অন্ধকার ভবিষ্যত,
এখন এদের মনের তালা চাবিতে রুদ্ধ !

ক্লাশ শেষের ভাঙা হাটে
মুখর, স্তব্ধ, নাস্তিক, ধার্মিক এই ছেলেমেয়েগুলোর
তীক্ষ্ণ না-দেখা আমার মননে কড়া নেড়ে যায়:
আর বিলম্ব নয় বন্ধু,
এখন তোমার পথে নেমে ধূলো মাখার পালা –

শুভ্র দাস – গত তেইশ বছর ডেট্রয়ট, মিশিগান নিবাসী। পেশায় মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারং-এর প্রফেসর। জন্ম ও ছোটবেলা কেটেছে হাওড়ায়। পড়াশোনা খড়গপুর আই. আই. টি ও আইওয়া স্টেট ইউনিভার্সিটিতে। নেশার মধ্যে ছবি তোলা ও ছবি আঁকা, লেখালেখি, ঘুরে বেড়ানো, নাটক ও পলিটিক্স। বর্তমানে রেসিস্টেন্স মুভমেন্টে অনেক সময় কাটছে।

সুজয় দত্ত

কবিতার আসাযাওয়া

আয়োজন করে, আসর সাজিয়ে কবিতাকে যত ডাকি
সে দেখি কেবল পালিয়ে বেড়ায়, বারে বারে দেয় ফাঁকি ।
দুচোখে যখন না-বলা কথারা ভীড় করে দলে দলে —
দুঠোঁটের মৃদু কাঁপনে হৃদয় তখন কবিতা বলে ।

কত মাত্রার ছন্দে লিখছে ? পয়ার ? অনুষ্টুপ ?
বিতর্ক চলে তাত্ত্বিকদের, কবিতাই থাকে চুপ ।
তর্কের শেষে সন্ধ্যা ঘনায়, একফালি চাঁদ ওঠে —
শ্বেতকরবীর কুঁড়িতে কুঁড়িতে কবিতা ফোটে ।

রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, বায়রন, কীট্স, শেলী —
সারাটা জীবন মহাকবিদের জীবনীই পড়ে গেলি ।
বুঝলি না হায় কবিতা থাকে না লিটারেচারের ক্লাসে ?
মনের আকাশে মেঘ করে এলে তবেই কবিতা আসে ।

বড় বড় সব প্রকাশনী, নামী কাগজে প্রচুর টাকা —
দশটা-পাঁচটা কবিতা লেখার চাকরিটা হোক পাকা ।
অর্ডারি লেখার বাজারেতে চলে কবিতার কেনাবেচা —
ঝিনুকের খোলে ভরে শুধু হাত, মুক্তো হয় না ছেঁচা ।

হৃদয়সাগরে ডুব দিয়ে দেখ, কান পাত অন্তরে —
হয়তো বা কোনো মায়াবী সকালে কোনো জাদুমন্তরে
খুলবে মনের বন্ধ দুয়ার, কত রঙ কত ছবি
আঁকা হবে অনুভূতির তুলিতে, জন্মাবে এক কবি ।

সুজয় দত্ত — ওহায়োর অ্যাক্রন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিসংখ্যানতত্ত্বের (স্ট্যাটিস্টিক্স) অধ্যাপক। জৈবপরিসংখ্যান বিশ্লেষণতত্ত্বের (বায়োইনফর্মেটিক্স) ওপর ওঁর একাধিক বই আছে। কিন্তু নেশা তাঁর সাহিত্যে। সাহিত্য তাঁর মনের আরাম। গত বারো বছরে আমেরিকার আধ ডজন শহর থেকে প্রকাশিত নানা সাহিত্যপত্রিকায় ও পূজাসংখ্যায় তাঁর বহু গল্প, কবিতা, রম্যরচনা ও অনুবাদ বেরিয়েছে। তিনি ''প্রবাসবন্ধু'' ও ''দুকূল'' পত্রিকা সম্পাদনা ও সহসম্পাদনার কাজও করেছেন।

ধীমান চক্রবর্তী

দেশ

নৌকাটি বহু-দাঁড়, বহুজন মাল্লা
কেউ বলে গড, কেউ রাম, কেউ আল্লা
কেউ নেয় গুরু-নাম, কেউ ডাকে জেহোভা
মুখ বুজে চুপচাপ দাঁড় টানে কেহ বা

কেউ খায় চিঁড়ে, কেউ শাক, কেউ মৎস্য
শোর, গরু চাখে কেউ, কেউ ছাগবৎস
উর্দু জবান কারও, কারও ভাষা ওড়িয়া
কেউ ইঞ্জিরি ঝাড়ে দুই পাতা পড়িয়া

কেউ পরে লুঙ্গি, কে ধুতি, কেউ পাতলোন
গঙ্গাসাগরে কেউ লেংটিতে মাতলো
কারও দাড়ি লালরঙা, কারও মাথে পাগড়ি
কপালে সিঁদুর কারও, কারও কানে মাকড়ি

মেখলা, কুর্তা-জীন্স, সালোয়ার, বোরখা
সাঁওতাল, ভীল, মুচি, ব্রাহ্মণ, গোর্খা
আদিবাসী কেউ, কারও আমদানী হালেতে
সকলেই চায় হাওয়া নৌকার পালেতে

কারও ত্বক আবলুশ, কারও চোখ নীলচে
কত ডিএনএ-র ধারা এ তীর্থে মিলছে
মোদ্দা তো একই বই নানাবিধ মলাটে
চালাবে কি ক্ষুর একে অন্যের গলাতে ?

কারও প্রেম ত্রিশূলে তো কারও চাঁদ-তারাতে
নিজ-নিজ বিশ্বাস কেন হবে হারাতে ?
পড়ুক কেতাব যার মন যেটা চাইবে
কোরান, গ্রন্থ, গীতা, ত্রিপিটক, বাইবেল

ধর্ম জানতে কেন চায় আদমশুমারি?
কোহিমা টু বারমের, জম্মু টু কুমারী
বিভেদকামীরা আর কত চাল চালিবে?
একই দেশে জন্ম যে কালিদাস ও গালিবের!

আইয়েঙ্গার হোক, পার্শি বা সর্দার
সকলেই ভারতীয়, কেউ নয় গদ্দার
শিব ঠাকুরের দেশ সবে দেয় কলিকে -
ক্রুশে বেলপাতা, দোয়া বজরংবলীকে।

ধীমান চক্রবর্তী — জন্ম : ১৯৬৬ কলকাতা। বাল্য দিল্লিতে, কৈশোর কলকাতায়, প্রথম যৌবনের অধিকাংশ মুম্বাই-তে অতিবাহিত হওয়ার পর থেকে প্রবাসী — প্রধানত এবং বর্তমানে মার্কিন মুলুকে, কিছুটা সময় জার্মানি এবং ফ্রান্স-এও। পেশায় পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ও গবেষক। কাজের বাইরে সর্বঘটে কাঁঠালি কলা। নেশা : চা, ঘুম, কলকাতা।

মানস ঘোষ

ফেসবুক

আজ সারাদিন ফেসবুক করে
মাথাটা গিয়েছে গুলিয়ে
রাতে টুথপেস্ট লাগিয়েছি ব্রাশে,
জুতোতে দিয়েছি বুলিয়ে।
দিদিকে ডেকেছি অ দিতি বলে,
ছেলেকে বলেছি জিষ্ণু !
শালাটার নাম ?! কি জানি কি ছিলো ?
কাব্য ? দেবো বা বিষ্ণু ??
রক্তচক্ষু মিলি তেড়ে আসে
যেমতি জাগরী বাস্কে
তোমার ম্যাও তুমি সামলাও,
আমারটা গেছে ফস্কে !
বলে ধুত্তেরি, তুলি পাততাড়ি,
ফেসবুক থেকে পিঠটান
আর নয় দেরি,
হাটে ভাঙ্গে হাঁড়ি,
কোরো না কো যেন পাঁচকান।

দাবানল

এ অপচয় তোমাকে মানায় না কবি !
এ নিশ্চেষ্ট সময় ...
ঝুরো বালির আরামকেদারায় এ সৈকতবিলাস,
জানো না কি হলকা বাতাসে আসা
দাবানলের খবর ?
হরিণের ত্রস্ত ছুটে যাওয়া,
সবুজের পোড়া গন্ধ ?

তোমার অশ্বত্থের পাতা ছাওয়া দিন ...
তোমার ফ্লুরোসেন্ট উদ্বায়ী রাত ... তোমার
সম্মাননার ছোট বড়ো স্তম্ভসঙ্কুল পথ ...
পার হয়ে, সব খবর আর বুঝি পৌঁছায় না, ...
নাহলে জানতে পারতে, যে পাখিটাকে নিয়ে
গান লিখেছিলে, পরম মমতায় ...
তার ডানাতেও আজ জঙ্গলের আগুন !

মানস ঘোষ – মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিপ্লোমা করার পর, বেছে নেন, সমস্ত আবেগ, ভাবালুতা আর ব্যক্তিগত পরিসরকে তছনছ করে দেওয়ার মতো ঝুঁকিপূর্ণ এক পেশা, ভারতীয় রেলের ''ট্রেনচালক''। এই গ্রহে উনিই প্রথম ট্রেনচালক যার একটি বাংলা কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছে। জীবিকা যাপন ও প্যাশনের এই পাহাড়প্রমাণ বৈপরীত্যের যন্ত্রণা কখনো তাঁকে স্তব্ধ করেছে, কখনো আবার আলোকিত বর্ণমালা নিয়ে হাজির হয়েছেন খোলা 'বাতায়ন' পাশে, আমাদের মাঝে।

জয়ন্তী বন্দ্যোপাধ্যায়

অসম্ভব

ট্রাইফোকাল চশমার ফাঁকে
গোল গোল চক্ষু দু'টি তুলে,
বলেন কাকাবাবু –
'যতসব আজকাল কম্পিউটার আর
বৈদ্যুতিন . . .
কী যেন বলিস তোরা ? - ক্লাউড
কম্পিউটিং ?
ধুস . . . এতই নাকি সোজা মেঘের মধ্যে লেখা,
রান্নার প্যাঁচপয়জার !?
ওরে শুক্তোর কি আর ফিউসন হয় ?
চচ্চড়ির রিমিক্স !
আর ওই ধানিলঙ্কা কেটে, গোটা সরষে বেটে
ভাতের মধ্যে ভাপা ইলিশ ? আহা রে !
আ-হা-হা !
তোদের ঐ রেসিপি ডট্ কম নাকি বলে,
গুঁড়ো কোলম্যান্স দিলেই বেশ চলে !
এদের পাগল বলবো না অন্য কিছু ?
তোরাও তো দেখি চলেছিস অসম্ভবের পিছু পিছু ।

তিন চামচ ভাত আরও নিয়ে
রসিয়ে মাখেন কাকা সর্ষেমাছটি দিয়ে ।
খাওয়ার শেষে একমুষ্টি ভাজা জোয়ান মুখে
হেঁকে ওঠেন পিতৃ-অনুজ,
'পেয়েছিস তুই বৌদির হাতটি ঠিকই,
যেমন তিনি রাঁধতেন শুক্তো
রাঁধুনি ফোড়ন দিয়ে ।
ওরে, দুধের স্বাদ কি আর মেটে ঘোলে ?'

মিনমিনে স্বরে হাত কচলিয়ে বলি,
'রাধুনি ছিল বাড়ন্ত, তাই, বুঝলে কাকু,
কি আর করি, ফোড়নে ছেড়েছি –
থাইম, সেজ আর বেসিল ।

পাওয়া যায়নি উচ্ছে আর পটলও ।
তাই দিয়েছি জুকিনি আর র‍্যাডিশ ।
– স্যামোন মাছটা, ডিজন মাস্টার্ড আর
ইওগার্টের সসে বেক করে . . .
আমি খুশি যে লেগেছে তোমার ভাল ।
ও কি কাকু ? ষাট ষাট ! বিষম খেলে ?'

'যুগ যুগ জিও ! অসম্ভবের সম্ভাবনা !'
মুচকি হেসে বলল দুই হাত তুলে,
সাপ্তাহিক বাংলা স্কুলে পড়া
আমার
অ্যামেরিকান ছেলে ।

আমার
অ্যামেরিকান ছেলে ।

Dr. Jayanti Bandyopadhyay – is a Professor of Accounting and the Graduate Program Coordinator at the Bertolon School of Business at Salem State University in Salem, Massachusetts. Her research interests include internationalization of accounting services, tax and international accounting issues, case studies, micro-financing, and measuring the impact of investment in bottom of the pyramid segments.

Jayanti co-founded SETU (Stage Ensemble Theatre Unit), a not-for-profit English theatre group portraying Indian origin plays in English in Boston, Massachusetts. She loves to write stories occasionally and is a passionate cook. She was born in Kolkata, India. She currently lives in Boston with her husband, Gautam. She has five grandchildren between the ages of 6 months to five years who are the fuel for her other passion in life.

সৌমিত্র চক্রবর্তী

সুখোসুখি দুখোদুখি
বহুদিন পর মুখোমুখি

দুয়ার এঁটে ঘুমিয়ে আছে
তখন সারা পাড়া
আমি বললাম, আমিও যাই
তুই বললি, দাঁড়া।

আমি বললাম, কি বলবি
তাড়াতাড়ি বল
তুই তখন পাড় ছাপানো
টলটল টলমল।

রাত্রি হঠাৎ থমকে গেছে।
অলীক ব্যথার পায়ে
স্তব্ধতা গেঁড়েছে শেকড়
ভুলে যাওয়া ঘায়ে।

অভিমানের আরেকটা নাম
পকেট থেকে পড়ে,
ধ্বংসের দিকে গড়িয়ে গেছে
কবিতার থেকে সরে।

আমার বুকে মস্ত পাথর
পাথরে চাপা নদী
নদীতে ভাসে তোকে দেখা
স্বপ্ন নিরবধি।

স্বপ্ন চায় ফিনিক্সি গান
ঘুরপাক খাওয়া জলে
ছোট বড় যতি চিহ্ন
কবিতা গড়ে চলে।

সে কবিতার অঙ্গে অঙ্গে
নব পুলকের সাড়া,
দুয়ার এঁটে ঘুমিয়ে ছিল
তখন সারা পাড়া।

সৌমিত্র চক্রবর্তী – পেশায় চাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট। নিজেকে যতটা সম্ভব আড়ালে রেখে আর্থিকভাবে দুর্বল স্কুল পড়ুয়াদের জন্য কাজ করতে ভালোবাসেন। তাদের জন্যেই ভালোবাসার উপহার 'খেলার ছলে' পত্রিকার মূল কান্ডারি। তাঁর কবিতা, ছোটগল্প ইতিমধ্যেই 'দেশ', শারদীয়া আনন্দবাজার, বা সাপ্তাহিক বর্তমানের মত বহুল প্রচারিত পত্রিকায় জায়গা পেতে শুরু করেছে। এবারেই প্রথম কলম ধরেছেন বাতায়নের পাঠকদের জন্য।

স্নেহাশিস ভট্টাচার্য

অগোচর

অলস ক্লান্তি মেখে নির্জনের হাত ধরতে ইচ্ছে করে খুব
নির্জন জনঅরণ্যে হারিয়ে
বার বার সেই তুমি – আমি'র ঘেরাটোপে গুমরে মরে।

খুব ইচ্ছে করে বাতাসে মিশে গিয়ে রোদ্দুরকে জড়িয়ে ধরে বলি
জ্বালিয়ে দে, পুড়ে ছটফট করি,
এক কোণে নিদাগ বসন্ত শীতল হাওয়া নিয়ে ছবি আঁকে।

উষ্ণ চুম্বন ছোঁয়া দোকলা দুপুর
শরীরে মেতে রিংটোন বদল,
ফিসফিস করে শীতের গল্প বলে।

মুখ ফেরানো ভালবাসা বাসা বদলে ছায়া খুঁজে পেয়েছে।
তারাদের দল ছায়াপথ মাড়িয়ে রাত জাগা চোখে জোনাকি,
কি এক ক্রন্দন ঢেউ হয়ে পাড় ভাঙে
নতুন পোশাকে ভাঁজ হয়ে লাল বেনারসীর জরি।

হাত বাড়াস না আর হাঁটতে শিখে গেছি
টলমল করে টলটলে চোখে আর তাকাই না
মুখ ফিরিয়ে আনন্দ অনাবিল
অজুহাত আর মন ছোঁয় না।
রাত মোহানা ভোর হয়ে বিছানায়
লাল হওয়া দুটো চোখে লালচে সূর্য।

বিধি মেনে লিখে নেওয়া
মন যাপনে তোর নাম,
চলে যাওয়া মুছে ফেলা অনায়াস
শুধু পথ চলা ফিরে দেখা
ঘষা কাচ দৃশ্য অগোচর।

স্নেহাশিস ভট্টাচার্য – কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য সম্প্রচার দপ্তরের কর্মী। বর্তমানে কলকাতা দূরদর্শন ভবনে কর্মরত। বহুদিন থেকেই চলে আসছে সাহিত্যের নিবিষ্ট পাঠ এবং নিভৃত চর্চা। পেশাগত ও পারিবারিক ব্যস্ততায় যখন হারিয়ে যেতে বসেছিল তাঁর এই সৃষ্টিশীলতার ধারা, সে সময় এক বুধ সকালে আকাশবাণী মৈত্রীতে তাঁর নিজের লেখা পড়তে শোনা (এবং তারপর থেকে প্রায় নিয়মিত সেরার বাছাই এর তালিকায়), তাঁর সাহিত্যচর্চায় নতুন উৎসাহের সঞ্চার করে। সেই থেকেই চলে আসছে জীবনের জলরঙে স্বপ্ন বোনার কাজ, কখনো ছন্দে, কখনো বা গদ্যে . . .

স্নিগ্ধা সেন

বালান্টির বেলুন

গাড়ী আটকিয়ে পড়েছি জ্যামে — হল মিনিট বিশ তো
পাশের কাঁচটা আধখোলা — দেখছি অলস দুচোখে
দেখছি জীবন ছুটছে, ছুটছে, ছুটছে তাড়নাস্পৃষ্ট
মানুষ সচল, যানই অচল, স্কুটার গুঁতিয়ে ঢোকে ।

উদ্বেগে আকুল, বাড়ছে সময়, আঁকড়ে ধরেছি সিটের কোণা
শুনছি আবছা ভীতু ভীতু স্বরে কি যেন বলছে, মারছে টোকা
'বালান্টি সাব কো গুলাব লায়া, দস্ রুপেয়ে মে, এক ঠো লো না'
তাকিয়ে দেখছি নেতিয়ে পড়া গোলাপ হাতে পুঁচকে খোকা ।

কাঁধ থেকে সুতো, বেলুন উড়ছে, লাভ সিম্বল, খুব পরিচিত
আমাকে বলছে ? ছাঁটা শনচুল, ভুরু কুঁচকানো পুরু চশমাকে ?
প্রেমিক পোস্টারে ওপাশে হাঁটু গেড়ে, ফুল পেয়ে মেয়ে ভারী বিগলিত
ম্রিয়মাণ ওই গোলাপের তোড়া ভালবাসা আমি হাতে দেব কাকে ?

বালান্টি সাহেবের নার্সারিটি কোন পাড়াতে ? নামটা আজব
সেখানকার গোলাপের বুঝি আলাদা গন্ধ ? আলাদা গুণ ?
জানে না বালক, জানে শুধু আজ বালান্টি সাহেবের নামে পরব
''কিনব না'' শুনে আঁধার চোখে, মুখ তার হতাশায় করুণ ।

দয়া হল, তাই ফিরে শুধোলাম, ''এই ফুল দিয়ে লোকে করেটা কি''
জবাব ত্বরিতে আসে, শেখানো বুলির মত, অনায়াসে, ''প্যার, মহব্বত''
ফুলগুলো নিয়েছি হাতে, দামটুকু শুধু দেওয়া রয়ে গেছে বাকি
খুশিতে আত্মহারা বালক বলেছে — ''বেলুন নহি চাহিয়ে ? উও মুফৎ'' ।

নিয়েছি বেলুন হাতে, হঠাৎই আঙুল আমার হারাল খেই
ছেলে বলল ''দেখো, দেখো, এ নহি রহেগা আপকা পাস''
সার সত্য বুঝেছে বালক, ভালবাসার ধরণটাই তো এই
উড়বে, পালাবে, ক্ষণে দেবে আশা, পরক্ষণে কাটবে ফাঁস ।

স্নিগ্ধা সেন পারিবারিক সূত্রে ওপার বাংলার হলেও আজন্ম কলকাতারই বাসিন্দা। চল্লিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপনা করেছেন, প্রথমে ভিক্টোরিয়া ইন্সটিউশনে, এবং পরে একাধিক ওপেন ইউনিভার্সিটিতে। সাহিত্য চর্চার শখ বহুদিনের। এই আশী উত্তর বয়সেও সে চর্চা চলছে পূর্ণ উদ্যমে। কলকাতার অনেক পত্র পত্রিকায় লেখা বেরিয়েছে – গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ। সাম্প্রতিক প্রকাশিত দুটি বই – "হ্যামলেট" এবং "ওদের কি খেতে দেবে"।

তৃপ্তি বন্দ্যোপাধ্যায়

অনন্যা

আমি অনন্যা
আমি নিত্যা, শক্তিস্বরূপা
ত্রিগুণের আধার, গুণস্বরূপা
আমি প্রকৃতি !

আমি নির্গুণ নই, সগুণ-ক্রীড়াময়ী
তাই তো গাছের পাতায়, ফুলে ফলে
এতো রঙের বাহার এত সুগন্ধ ।
নদ, নদী, সমুদ্রের ঊর্মিমালায়
এত শোভা শান্তি, আনন্দ
আবার রুদ্রাণী রূপে তান্ডবের নৃত্যলীলা
বসুন্ধরা ঐশ্বর্য্য-গর্ভা —
কিন্তু আরও গভীরে; —
আগ্নেয়গিরির লেলিহান শিখা দীপ্যমান

পাহাড়ে, পর্বতে, কন্দরে, গুহায়
ওঁ -কার ধ্বণি
অধ্যাত্ম চেতনায় মূর্ত অনুপমগীতি ।

সমাজে, সংসারে —
আমি কখনও জননীরূপা স্নেহময়ী
সেবাধর্মে সৃজনশীলা ছোট্টরা
প্রেমময়ী জায়া, আনন্দময়ী আত্মজ

কিন্তু প্রলয় কালে
আমি ভীমা, কঠোরা প্রলয়ঙ্কারিনী ।
আমি নারী — আমি প্রকৃতি
আমি অনন্যা ।

তৃপ্তি ব্যানার্জীর ছোটবেলা কেটেছে হুগলী জেলার এক গ্রামে । ছোটবেলা থেকে পড়াশোনায় গভীর আগ্রহ । বিজ্ঞানের ছাত্রী হলেও সাহিত্যের চর্চা চালিয়ে গেছেন সমানে । পেশায় তিনি ছিলেন একটি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা । অবসর জীবন বই পড়ে, গান শুনে আর লেখালেখি করে কাটছে সুন্দরভাবে ।

পারিজাত ব্যানার্জী

কবিতা সিরিজ

কয়ামত আর যুদ্ধবন্দী প্রেম

৩) দেশনায়কের প্রেম বনাম যুদ্ধ নামের রোগ

মনে আছে প্রিয়তমা, যেদিন তোমার প্রথম পরশ ভাসিয়ে দিল প্রাণবন্দর –
সেদিনই গুছিয়ে নিয়েছিলাম চেতনে আমার চন্দনকাঠের চিতার অভ্যন্তর !

ভালোবাসা যে ক্ষণে উদ্ভাসিত হয়ে মন্ত্রণা দেবে পক্ষপাতের –
সেক্ষণেই লব বিরতি – ঝাঁপ দেব প্রজ্বলিত গভীরে – রসাতলের !

মৃত্যু মরীচিকার ঠুলি শক্ত করে দেখো, কেমন এঁটে নিয়েছি দুনয়নে –
তোমার জহরতের রোশনাই আর বিচ্ছুরিত হতে দেবো না কোনো স্বপনে !

কে বলে ভালোবাসা শুধু ঈশ্বরের দেওয়া অমোঘ নজরানা !
পঙ্কিলতায় পূর্ণ হৃদয় জানে, এ কেবলই ভীরু মনের দ্যোতনা !

৪) বন্দিনী রাজনন্দিনী অসহায় শেষ স্তবক

ইন্দ্রপুরীতে এখন কত রাত হবে ? এ ঠিক কত প্রহর ?
চার দেওয়ালের ঝংকার বলে চেঁচিয়ে – সমাপ্ত হয়েছে প্রেমসফর !

শুরু হয়েছিল কবে, তোমার কি আর মনে আছে সেসব এখন ?
সবুজ প্রান্তর শেষে বিষাক্ত কীট জানি, সেদিনই করেছিল দামামার বীজ রোপণ !

ভালোবেসে হারার কথা অনেক শুনেছিলাম বটে আগে –
জেতার জন্য প্রণয়ীর ধ্বংসাবশেষ কুড়োনো, এ গল্পে তাই হোঁচট লাগে !

এখনো পারো না প্রেমের নামে যুদ্ধজোয়ার করতে রত –
নাকি হত্যাবিলাসীর রন্ধ্রে রন্ধ্রেই আজ জমেছে বিষ, ধোঁয়া আর ক্ষত !

পারিজাত ব্যানার্জী – জন্ম ধানবাদে হলেও লেখিকার আদ্যপ্রান্ত বেড়ে ওঠা কলকাতায়। বিবিএ, এমবিএ পাশ করে টানা আট বছর কলকাতায় রিয়াল এস্টেটে চাকরি করলেও বরাবরই লেখালেখিতেই তাঁর প্রধান ঝোঁক। ইতিমধ্যেই কলকাতায় প্রকাশিত হয়েছে ছোটগল্প, উপন্যাস এবং কবিতা সংকলন মিলিয়ে তাঁর পাঁচ পাঁচটি বই। এছাড়াও বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তাঁর আরও বেশ কিছু লেখা। প্রথম পুরস্কার পেয়ে সম্মানিত হয়েছেন অধ্যাপক কবি আব্দুর রসিদ চৌধুরীর স্মরণ প্রতিযোগিতায়। বর্তমানে স্বামী সুমিতাভ'র সাথে তিনি অস্ট্রেলিয়ার সিডনি শহরে বাস করছেন কর্মসূত্রে।

সৌমিক ঘোষ

জলের উপর জল বয়ে যায়

জলের উপর জল বয়ে যায়
জল টলমল চোখ
জলের কাছে শপথ করি
ওদের ভালো হোক ।

আগুন পোড়ায় সুখ চেয়েছি
পেলাম পোড়া সুখ
বুক ভরা রোজ জল বয়ে যায়
আগুন পোড়া বুক ।

শেষ যৌবন, বৈভব শেষ
ছাপোষা এখন কবি
মন বেঁচে মন শরীর এখন
অস্তরাগের ছবি ।

জলের উপর জল বয়ে যায়
জ্যোৎস্না নামে জলে
জল ধুয়ে দেয় জ্যোৎস্না মলিন
রাত্রি কথা বলে ।

সৌমিক ঘোষ – সিডনী নিবাসী তরুণ এই ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারটি পেশাগত ব্যস্ততার ফাঁকেও খুঁজে নিয়েছেন, নিজের জন্য এক অন্য আকাশ, অন্য পরিচয় . . . গীতিকার ও নাট্যকর্মী । তাঁর কবিতাতেও তাই গীতিময়তার আভাস, নাটকের দৃশ্যমানতা। প্রথম প্রকাশ সাঁঝবাতি পত্রিকায় ২০০১সালে ।

তাপস রায়

পসারীণি

অয়েল ক্যানভাস পেন্টিং

পুরোনো দিল্লী। কালো হয়ে আসা বিকেল, বিকেলের ঘন্টা, ঘন্টাঘরের দেওয়ালে পসারীণি ছায়া। ক্রেতার মন ছিলনা পসরায়, চোখে তার ছেঁড়া ঘাগরার মায়াজাল, হাতছানি দিয়ে ডাকে বেদুইন লোভ। বানজারা মন তখন অনেক দূরের বালিতে কাঁটাঝোপে বিষাদ লিখে রাখে। সে বিষাদ শিল্পীকে নিমেষে পোড়ায়। শিল্পীর মনে হয় এ নারী আদিম, দুঃখ-সুখের লক্ষণরেখা পেরিয়ে হেঁটে আসে। বাজারের কলঙ্ক, চাহিদা, লালসা একে ছোঁয়না। কপিল চোখের দ্বেষে টাঙ্গানো উলঙ্গ সমাজ ঘৃণা। নাকি অবজ্ঞা। সুখ টানে মিশে যায় হাওয়ায় হাওয়ায়।

রজতশুভ্র মজুমদার

মৃত্যুর পরের দিন লেখা একটি ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ

নবনীতাদির সম্পর্কে আর কী লিখব ? এত স্মৃতি ভিড় করে আছে যে কাল থেকে বড় ভারী হয়ে আছে মন। যখন লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদনা করতাম – সে বহু বছর আগের কথা – তখন থেকেই তাঁর অকৃপণ ভালোবাসা পেয়ে এসেছি ! আমার সম্পাদিত পত্রিকার নাম ছিল ওঁর বাড়ির নামে ! হয়তো কাকতালীয়ই, কিন্তু তাঁর আবেগপ্রবণ হৃদয় এই জিনিসটাকে চিরকাল অন্য চোখে দেখে এসেছে ! হয়তো সেজন্যই, নয়তো অন্য কারণে, 'ভালোবাসা'র কোনো সংখ্যাই তাঁর গদ্য বা কবিতা বা অনুবাদ ছাড়া বেরোত না। সময় সুযোগে কখনও সে লেখাগুলো পড়াব আপনাদের। একবার হলদিয়ায়, মনে আছে, সবার মাঝে আমায় আদর করে দিয়েছিলেন গাল টিপে, সঙ্গে আমার সম্পর্কে অনেক ভালো ভালো কথা ! আমি তখন অনেক ছোট, সবে একটা কি দুটো কাব্যগ্রন্থ বেরিয়েছে ! ভীষণই লজ্জা পেয়ে টুপ করে প্রণাম করে দ্রুত স্থান ত্যাগ করেছিলাম, মনে পড়ে।

আমার যখন প্রথম গদ্যের বই বেরোবে, সমস্ত পাণ্ডুলিপিটা গভীর মমতায় পড়ে দেখেছিলেন তিনি। সাজিয়ে দিয়েছিলেন গদ্যগুলো। প্রয়োজনীয় পরামর্শ/উপদেশ দিয়ে সুন্দর করে একটা ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন সে-বইয়ের ! 'পুনশ্চ' থেকে কলকাতা পুস্তকমেলায় 'সামান্য লেখা' বেরোল তাঁর একটি অসামান্য ভূমিকায় সমৃদ্ধ হয়ে। সে-ভূমিকার কথা আমার পাঠকমাত্রই জানেন, এই মুখ পুস্তিকাতেও বহুবার তাঁরা এ নিয়ে মন্তব্য করেছেন।

একবার সুনীলদার ওখানে, কৃত্তিবাসের অনুষ্ঠানে, মনে পড়ছে, তিনজনের কবিতাপাঠ ছিল – মল্লিকাদি, জয়দেবদা আর আমি – পাঠের পর তাঁর অকৃত্রিম স্নেহস্পর্শে ধন্য হয়েছি। সেদিন নন্দনাও এসেছিল, মনে আছে। সুবোধদা ছিলেন, পিনাকীদা, কৃষ্ণাদি, আরও অনেকে।

নবনীতাদির ভালোবাসা ছিল সমুদ্রের মতো অকৃপণ ! তাঁর অপরিসীম উচ্চতা কিংবা বয়সোচিত গাম্ভীর্য কোনওটাই কখনওই আমার সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। কত কত বার তাঁকে নিজের অনুষ্ঠানে নির্দ্বিধায় আমন্ত্রণ জানিয়েছি, আয়োজকদের দিয়ে গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছি, কখনও তিনি বিরূপ করেননি আমায়। এ আমার পরম সৌভাগ্য। শেষবারও, একটা অ্যালবাম রিলিজ অনুষ্ঠানে অশক্ত শরীরে লাঠি হাতে – লাঠি নয়, আমরা বলতাম, ওটা জাদুদণ্ড – তিনি কিছুক্ষণের জন্য হলেও এসেছেন, এসে বসে থেকেছেন দর্শকাসনে, মঞ্চে উঠে কথা বলতে পারেননি। তাঁর সেই অমোঘ উপস্থিতিটুকু আমার সারা জীবনের প্রেরণা হয়ে থাকবে !

আর একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে খুব, যদিও সে কথা এখানে শেয়ার করা উচিত হচ্ছে কিনা আমি জানি না, 'দীপ প্রকাশন' থেকে একটা ঢাউস বই 'অভীপ্সিত রবীন্দ্রনাথ' সম্পাদনা করছি তখন। প্রায় সব লেখাই চলে এসেছে হাতে। কিন্তু মন আমার সন্তুষ্ট নয় একেবারেই। একটাই কারণ। অনেক চেষ্টা করেও অমর্ত্যবাবুর একখানা লেখা পাইনি। তিনি সরাসরি 'না' করে দিয়েছেন। দ্বারস্থ হলাম নবনীতাদির, নাছোড় সম্পাদকের শেষতম প্রচেষ্টা ! কী আশ্চর্য, নবনীতাদির অলীক জাদুমন্ত্রে সে কাজটিও হাসিল হয়ে গেল ! অমর্ত্যবাবু সময় দিলেন, লেখাও। সেই লেখা দিয়েই শুরু হল গ্রন্থটি। পরবর্তীতে ওই বই দীর্ঘদিন বাংলা বইবাজারে 'বেস্ট সেলারে'র তকমা নিয়ে রাজত্ব করেছে, সে কথা আপনারা নিশ্চয়ই জানেন।

একবার দিদির সঙ্গে ভীষণ প্রয়োজন। তিনি তখন বিদেশে। কোনওভাবেই যোগাযোগ করতে পারছি না। শেষমেশ নন্দনা দিল তাঁর মেইল আই ডি। যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম ! আর আজ ? কোথায় পাব তাঁর মেইল আই ডি ? কত কত বার

তো তাঁর কলকাতার বাড়িতে গেছি, আর গেলে পাব তাঁর দেখা ? ল্যান্ড লাইনে ফোন করলে শেষ দিকে বেশিরভাগ সময়ই বাড়ির পরিচারিকা বলতেন, "উনি এত দূর আসতে পারছেন না, মোবাইলে করুন"! মোবাইলে কখনও ফোন না-ধরা হতেন না ! আর মোবাইল ধরবেন আমার ? ধরবেন কোনও দিন ? যে মানুষটা আমাকে 'সোনা' বলে সম্বোধন করতেন, আদর করতেন অনির্বচনীয় স্নেহে, এই অনাগত শীতের হাওয়ায় এই বৃষ্টিসম্ভবা আকাশের নিচে নিভৃত স্বজনবিয়োগব্যথায় আজ তাঁর জন্য বুকের ভেতরটা বড় হুহু করে উঠছে !

রজতশুভ্র 'দেশ' পত্রিকার নিয়মিত লেখক। পার্থ ঘোষ, গৌরী ঘোষ থেকে শুরু করে বহু বিখ্যাত বাচিক শিল্পীর কণ্ঠে তাঁর কবিতা নিয়মিত শোনা যায় আকাশবাণী, দূরদর্শন কিংবা বিভিন্ন মুক্ত মঞ্চে। তাঁরই কবিতায় সমৃদ্ধ আমন-অডিও থেকে প্রকাশিত দুই প্রখ্যাত থিয়েটার ব্যক্তিত্ব রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত ও দেবশঙ্কর হালদারের যুগল এলবাম 'কবিতা ১ ও ২' বিশেষ জনপ্রিয়। রজতের '১০০ প্রেমের কবিতা'র প্রায় সব কবিতাই কোনো না কোনো অডিও ভিডিও এলবামে অন্তর্ভুক্ত। মূলত 'দেশ' ও 'কৃত্তিবাস'-এ প্রকাশিত এই কবিতাগুলি প্রেমের গহন অনুভব কথা !

দেবীপ্রিয়া রায়

বসন্ত এসে গেছে

পলাশ, শিমুলে রঙের মাতামাতি, মহুয়া আর বকুলের গন্ধে চারিদিক আকুল । ভোমরার গুনগুনানি ভাসছে হাওয়ায়, আমের মুকুল ধরেছে, মাধবী লতার গুচ্ছ দুলছে দখিনা হাওয়ায়-কতদিন এমন বসন্ত দেখিনা । এখানে বসন্ত আসে দিনপঞ্জীর পাতায়, বরফ আর হিমেল হাওয়ার রেশ লেগে থাকে আনাচে কানাচে । গায়ে গরম জামা চাপিয়ে কান মাথা ঢেকে তবু আমরা দোল উৎসব পালন করি-করে যাই ফেলে আসা জন্মভূমির স্মৃতির উদ্দেশ্যে । আমাদের উৎসব শুধু পিছু ফিরে চাওয়া-শুধু মনে করা । আজ সেই মনে করার পালা । রবীন্দ্রনাথ — তিনি ছাড়া আজও তো মনের কথা বলে উঠতে পারিনা । তাঁর গানেই নিজের কথা বলি —

‘এক ফাগুনের গান সে আমার আর ফাগুনের কূলে কূলে
কার খোঁজে সে পথ হারালো নতুন কালের ফুলে ফুলে ।।
শুধায় তারে বকুল হেনা, কেউ কি আছে তোমার চেনা ।’
সে বলে, ‘হায় আছে কি নাই
না বুঝে তাই বেড়াই ভুলে
নতুন কালের ফুলে ফুলে ।’

আসলে বসন্ত উৎসব আজও আছে দূর প্রান্তের নতুন কালের এই জগতেও; কিন্তু সে উৎসবে যে আমাদের মন ওঠেনা । আমাদের উৎসব ফুলে গন্ধে মাতামাতি, সে উৎসবে দেবতার প্রেম কথা যত মিশে আছে, তেমনি রয়েছে সদ্য মুকুলিত প্রকৃতির সাথে যৌবনের মদন মহোৎসবের ছোঁয়া । গানে কবিতায় নাচের ছন্দে তাই আমাদের বসন্ত উৎসবে চারিদিক মাতাল করা আনন্দ ।

ঋতু সংহারে কালিদাস তাই বসন্তের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন,

‘বাপীজলানাং মণিমেখলানাং
শশাঙ্কভাসাং প্রমদাজনানাং
চ্যুতদ্রুমানাং কুসুমান্বিতানাং
দদাতি সৌভাগ্যময়ম্ অয়ম্ বসন্তঃ ।।

বসন্ত ঋতুতে সরোবরের জল হয় স্বচ্ছ, উজ্জ্বল-তাতে অবগাহন করলে তৃপ্তি হয়, বসন্তের আনন্দে আমে মুকুল ধরে, আর যৌবনবতী নারীরা মণিমুক্তাসম্বলিত মেখলা অতি সহজে পরে বেশবাস করেন । এই ঋতুতে ‘দ্রুমা সপুষ্পা সলিল সপদ্মঃ স্ত্রীর্যঃ সকামাঃ, পবন সুগন্ধিঃ । সুখাঃ প্রদোষাঃ দিবসা চ রম্যাঃ, সর্ব্বম্ প্রিয়ে চারুতরম্ বসন্তে ।’ এ সময়ে বৃক্ষ পুষ্পিত, পুষ্করিণী ছাওয়া পদ্মফুলে, বাতাস গন্ধমদির-তাই রমণীরা প্রেমপ্রত্যাশিনী হন ।’ এ সময়ে মন সহজে নেশায় মাতে । মদির নেশায় বিভোল মন নিজেই যেন দখিনা বাতাসে উড়ে চলে যায় । তাই না কবির এমন গান গেয়ে ওঠা, ‘ওরে বকুল পারুল ওরে শাল পিয়ালের বন, আকাশ নিবিড় করে তোরা দাঁড়াসনে ভিড় করে, আমি চাইনে চাইনে এমন গন্ধ রঙের বিপুল আয়োজন । অকূল অবকাশে যেথা স্বপ্নকমল ভাসে, দে আমারে একটি এমন গগন জোড়া কোণ’ ।

এই প্রেমের উৎসবে তাই আমাদের দেবী দেবতারাও মাতেন মিলনোন্মাদে। রাধা আর কৃষ্ণের প্রেমলীলার গান, মিলন বিরহের কাহিনী এই সময়ে তাই উত্তর ভারতের কোনায় কোনায় ধ্বনিত হয়। কোন দূরকালের গোপগৃহে পালিত রাজার কুমার কিশোর কানাইর বাঁশীর সুরের হাতছানিতে মন মজেছিল ঘরের বধূ কিশোরী রাধার। বাংলার কোমল মাটিতে কানাই হলেন প্রাণের ঠাকুর, তাই তাঁকে উদ্দেশ্য করে তাঁর প্রাণপিয়ারী রাধার মরমের গান গাওয়া হয়, 'হোলি খেলিব শ্যাম তোমার সনে, একলা পেয়েছি আজ নিধুবনে'। উত্তর ভারতের সবখানে সেদিন রাঙা আর গোলাপী ফাগের ছড়াছড়ি। যে ব্রজভূমে নন্দের নন্দন কিশোরটি এ খেলা প্রথম খেলেছিলেন, সেই বৃন্দাবনে খেলার স্মৃতিতে সেদিন পিচকারির রঙে সকলকে রাঙিয়ে দিয়ে কুঞ্জ ঘিরে গাওয়া হয়, 'হোলি খেলে নন্দলালা'। রঙের আভায় গোরী কিশোরীটি রাঙিয়ে উঠেছিলেন, কানাইয়ের কালো রং লালে ঢাকা পড়েনি, তাই গানের সুরে পরিহাসের ছোঁয়া লাগে, 'গোরী গোরী রাধা গুলাবী ভয়ি হৈঁ, রহ গয়ো কান্হা কালা বিরজ মেঁ। গোপন প্রেমের যন্ত্রণায় ব্যাকুল গৃহবধূটি সেদিন লুকিয়ে কেঁদেছিলেন সখীদের কাছে। সেই কথা মনে করে সেখানকার ব্রজ বালিকারা লাঠি হাতে বৃন্দাবনের চিতচোরদের শাস্তি দিতে যান। কিশোর কিশোরীর অবৈধ সেই প্রেমের গল্প খানিকদূরে অযোধ্যার উপকণ্ঠে গিয়ে রূপ নেয় বৈধপ্রেমের। রঙের খেলা, প্রেমের খেলা সেখানেও তবে সেখানে সে কাহিনী দীর্ঘ বিরহের পর পূর্ণযৌবনে নায়ক আর নায়িকার মিলনমেলার। রাবণবধের পরে নিজের স্ত্রী সীতাকে উদ্ধার করে এনে রামচন্দ্র বিরহিণীকে প্রেমের রঙে রাঙিয়েছিলেন। সেখানে তাই অযোধ্যাবাসীর কণ্ঠের গান 'হোলি খেলে রঘুবীরা অময়ধ মেঁ'।

খানিক পূরবে এসে বিশ্বনাথের নগরী বারাণসীতে এ প্রেমের কাহিনী রূপ নেয় শিব গৌরীর বিবাহোৎসবের। বসন্তের আগমন থেকে সেখানে বিবাহের তোড়জোড় শুরু হয়। শিব ভক্তরা সরস্বতীপূজার দিন শিবের তিলক উৎসব করেন - অর্থাৎ সেদিন তাঁকে গৌরীর পিতার তরফ হতে যৌতুক দিয়ে বর হিসাবে বরণ করা হয়। বলাই বাহুল্য ইনি আমাদের বাংলার ভুঁড়ো শিব নন, যাঁকে পত্নীর গঞ্জনা শুনতে হয় 'না মরে পাষাণ বাপ দিলা হেন বরে।' ইনি দেবাদিদেব বিশ্বেশ্বর, যাঁর মহিমমন্ডিত নৃত্যের তালে চরাচর ভুবন বিলুপ্ত হয়। তাঁর মিলন হয় সৃষ্টি স্থিতি বিনাশের অধিশ্বরী স্বয়ং অন্নপূর্ণার সাথে। এই মিলনোৎসবের ঘটার কথা কবির বর্ণনায় 'যবে বিবাহে চলিলা বিরোচন, তাঁর কতমতো ছিল আয়োজন।

ছিল কতশত উপকরণ।
তাঁর লটপট করে বাঘছাল
তাঁর বৃষ রহি রহি গরজে,
তাঁর বেষ্টন করি জটাজাল
যত ভুজঙ্গদল তরজে
তাঁর ববমববম বাজে গাল
দোলে গলায় কপালাভরণ
তাঁর বিষাণে ফুকারি উঠে তান।।'

রাজরাজাধিরাজের এ বিবাহ শিবরাত্রির দিন সুসম্পন্ন হয়, কিন্তু নবোঢা পত্নীটিকে উত্তর ভারতের নিয়মানুসারে শ্বশুরালয়েই রেখে আসতে হয়। তার পর একাদশী তিথিতে হয় তাঁদের দ্বিরাগমন - সে রাত্রি হবে তাঁদের প্রথম মিলনের রাত। সেদিন কাশীনাথ যান মূল মন্দিরের পুরোহিতের গৃহ হতে সদ্য পরিণীতা বধূটিকে পতিগৃহে নিয়ে আসতে - সমগ্র কাশীবাসী শোভাযাত্রা করে এই মিলন মহোৎসবের সূচনায় যোগ দেন। নাচে গানে মাতে সকলে, আবীর গুলালের রঙ-এ রঙীন হয় চারিদিক - প্রাচীন এ শহরের গলিঘুঁজিতেও নুড়ি পাথরের কাদা মাটিও সেদিন ঢাকা পড়ে রঙের খেলা-রঙ ভরী একাদশীর এই দিনে। সেদিন থেকেই দোল পূর্ণিমার দিন পর্যন্ত হোলিকা উৎসব শুরু হয় এ প্রান্তরে।

মুখপাতেই যেমন বলেছি বসন্তোৎসব আছে পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি কোণে । দীর্ঘ শীত ঋতুর পর, গাছে গাছে যখন সবুজের আভাস ধরে, তখন মানুষ মাত্রে তাকে উৎসবের মাঝে আবাহন করে নেয়, কিন্তু ভারতের বাইরে এই মাতাল করা আনন্দের রেশ তেমন নেই । যদিই বা আছে, তাতে নেই ভালবাসার ছোঁয়াচ ।

ভারতের পূবে রয়েছে চীন — বসন্তের আগমনে সেখানেও রঙীন উৎসবের সমাবেশ হয়, কিন্তু সেখানে রঙের মাতামাতি হয় রঙীন লণ্ঠন আর নানা ধরণের মুখোশের মাধ্যমে । শীতের শেষে ব্যর্থপ্রাণের আবর্জনা দূর করে নূতনকে আহ্বান জানানোর সূচনা করা হয় নিজের পুরাতন মুখ বা সত্ত্বাকে দূর করে দিয়ে নূতন মুখ বা মুখোশ পরে নাচার মাঝে । রাতে জ্বলে রাঙা আলোর চীনে লণ্ঠন চারিদিকে । এই লণ্ঠন জ্বালানোর উৎসবটি আগুন জ্বালিয়ে পুরাতনকে ভস্মে পরিণত করে ফেলার সূচক, অনেকটা যেন দোলের আগের রাতে আমাদের মতো শীতের শুকনো কাঠ সংগ্রহ করে হোলিকা দহন করা হয় ।

চীনের পর একটুকু সমুদ্রের ওপারে জাপান — বসন্ত কালে তাদের দেশ চেরি ফুলে ছেয়ে যায়, সেই চেরি ফুল ফুটে ওঠা নিয়েই তাদের বসন্তোৎসব । নানান ধরণের শোভা যাত্রা করে তারা একে ঘিরে, পান ভোজনের পালায় উন্মত্ততা থাকে বইকি, কিন্তু বাসন্তী প্রেমের বিভোল পরশ সেখানে থাকে না ।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশে বেশীর ভাগই একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী । একেশ্বরবাদের জন্ম । মধ্য প্রাচ্যে দেব দেবীদের কাহিনী সেখানে বিস্মৃতির মাঝে হারিয়ে গিয়েছে । তাই তাঁদের বসন্তে দেব দেবীদের প্রেমের কাহিনী খুঁজে পাওয়া দুষ্কর ।

ইহুদী ধর্ম, যার মাঝে বাকী দুটি একেশ্বর বাদী ধর্মের শিকড় প্রোথিত, তার মাঝেই বসন্তোৎসবের খানিক মাতামাতি দেখা যায় বটে, কিন্তু যেহেতু সেখানকার প্রকৃতিতে নেই এমন রঙ রসের খেলা, তাই সেখানকার বসন্তোৎসবে এই প্রেমের কাহিনী খুঁজে পাইনা । বসন্ত সেখানে নতুন অঙ্কুরোদ্গমের সাথে আশার সমাচার বহন করে আনে । সে আশা এক একটি ধর্মবিশ্বাসের সাথে ভিন্ন রূপ নিয়েছে । ইহুদীদের কাছে দীর্ঘ দাসত্বের পর এটি মুক্তির উৎসব । পেসাখ বা পাস ওভার তার নাম । মিশরের কাছে দীর্ঘদিন বন্দী অবস্থায় কাটিয়ে ঈশ্বরের কৃপা ও নির্দেশনায় তারা মুক্তি পেয়েছিল একদিন । সহায় সম্বলহীন একটি জাতিকে ঈশ্বর হাত ধরে একদিন স্বাধীনজীবনের পথে এগিয়ে দিয়েছিলেন । বিষন্ন দাসত্বের গ্লানি থেকে আশার আলোয় অবগাহন করার উৎসব তাই এটি, কিন্তু প্রেমের উন্মাদনা এতে নেই । এইদিন তারা একটি নৈশভোজের আয়োজন করে । সেই ভোজের থালায় তারা সাজিয়ে দেয় সিদ্ধ ডিম — নতুন জীবনের, নতুন আশার প্রতীক সেটি । থালায় আরো অনেক উপকরণ থাকে — প্রত্যেকটি তাদের দাসত্বের দিনের দুঃখ বেদনা অপমানের দ্যোতক । সেই সব উপকরণ দেখে তারা ঈশ্বরের অপার করুণায় সেই গ্লানি হতে নিষ্কৃতির জন্য তাঁকে নিজেদের ধন্যবাদ জানায় ও তাদের মনে আশা জাগে যে ভবিষ্যতেও বিপদে আপদে তিনি তাদের সাথেই থাকবেন । বসন্ত তাই আশার উৎসব, প্রেমের নয় । অবশ্য রঙীন আর আনন্দোচ্ছল একটি উৎসব তারা বসন্ত কালে করে — পুরিম তার নাম । পেসাখের আগেই সেটি পালিত হয় । কিন্তু প্রকৃতির রঙে রঙ মিলিয়ে ভালবাসায় মেতে ওঠার উৎসব সেটিও নয় । ইহুদীরা নিজেদের দেশ খুঁজে ফিরেছে চিরকাল । যুদ্ধ বিগ্রহ তাদের ইতিহাসের অঙ্গ, দাসত্বের পীড়া ভোগ করেছে বারবার । তাই পুরিমও আরেক দাসত্ব হতে মুক্তির উৎসব । অতীতে ব্যবলোনিয়া রাজা তাদের বন্দী করে নিয়ে গিয়েছিলেন নিজের শহরে । সেখান হতে তারা মুক্ত হতে পেরেছিল তারা এস্থার নামে এক সাহসিনী নারীর চেষ্টায় । পুরিম সেই বন্ধনমুক্তির উৎসব । অপরিমিত পান করে রঙীন জামা কাপড় পরে হুল্লোড় করা তাতে হয় বটে, কিন্তু প্রেমের সেখানে স্থান নেই ।

ক্রিশ্চিয়ানিটিতে এই পেসাখই পালিত হয় ইস্টার উৎসবে — যীশুর মৃত্যুর পর তাঁর পুনর্জীবিত হওয়ার উৎসব সেটি, কারণ যীশুর শেষ নৈশ ভোজ যাকে আমরা লাস্ট সাপার বলে জানি, সেটি ছিল এই পেসাখের ভোজ । ঈশ্বরের পুত্র মানবদেহ ধরেছিলেন, মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্তভার নিজের উপরে নিতে । তাঁর মৃত্যু তাই তাঁর অনুগামীদের নিরাশ করে ফেলেছিল আর তাঁর পুনর্জীবন নতুন আশা জাগিয়ে তুলেছিল তাদের মনে । সেই আশার বারতা ইস্টারের দিনে উপাসনায়

গম্ভীর ভাবে পালিত হয়। নূতন আশার, নূতন জীবনের প্রতীক হিসাবে ডিমকে রং করে শিশুদের দল, ছুটোছুটি করে খুঁজে বের করে লুকানো ডিম আর লুকানো ক্যান্ডি।

এই দিনটির আগেই অবশ্য তাঁর মৃত্যুর জন্য শোক পালন করা হয় ৪০ দিন ব্যাপী লেন্টের মাধ্যমে - সেটি কৃচ্ছসাধনের অনুষ্ঠান। তারও আগে ফ্যাট টুয়েসডে বলে একটি সপ্তাহব্যাপী আনন্দানুষ্ঠান পালিত হয় অবশ্য, কিন্তু তাতে কৃচ্ছ সাধনের আগে অপরিমিত আনন্দ ফুর্তি ও খাওয়াদাওয়া ছাড়া আর কিক্ষুর রেশ থাকে না।

বসন্ত তাই আমাদের কাছে যে আনন্দ, যে প্রেমের বার্তা বয়ে আনে সেটি অন্যধর্মে, অন্য দেশে দুর্লভ। তাই বলে তাদের উৎসব নিরর্থক নয়। সে আলোচনা আরেকদিন।

দেবীপ্রিয়া রায় — লিখছেন স্কুল ও কলেজের দিন থেকে। পেশায় দর্শন ও তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপিকা ও গৃহিণী। কাশীর প্রবাসী বাঙালী পরিবারের মেয়ে দেবীপ্রিয়া কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭৬ সালে ডক্টরেট করে বিবাহসূত্রে সেই বছরেই আমেরিকা এসে শিকাগো শহরে বাসা বাঁধেন। গত ৪০ বছর শিকাগোর বাঙালী ও অবাঙালী সমাজের সাথে নানা ভাবে জড়িয়ে রয়েছেন। সাহিত্য চর্চা দেবীপ্রিয়ার নেশা। শিকাগোর উন্মেষ সাহিত্য গোষ্ঠীর তিনি অন্যতম সদস্য।

অর্পিতা চ্যাটার্জী

স্ব-অধীনা

শান্ত ভাবে মেয়েটা বলে যাচ্ছিলো অনেক বছর আগেকার একটা বীভৎস রাতের কথা। যে সময়ের কথা বলছিলো, সেসময় সে অঞ্চলের মানুষের নিরবিচ্ছিন্ন রাতের ঘুম ছিলোনা। মেয়েটারও ঘুম ভেঙেছিল সেদিন ভয়ঙ্কর একটা বিস্ফোরণের শব্দে। জানালা দিয়ে যা সে দেখেছিলো সেদিন, তাতে গভীর রাতের সেই বিস্ফোরণে সারা বাড়িটার সাথে কেঁপে উঠেছিল ছোট্ট সেই মেয়েটির ভেতরটাও। লাল-কমলা-ধূসর সমস্ত রং মিলে অদ্ভুত সম্পূর্ণ বৃত্ত একটা যেন। আর সাথে ওই ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণের শব্দ। বাড়ির খুব কাছেই একটা মিসাইল পড়েছে। একটুর জন্য বেঁচে গেছে মেয়েটার বাড়ি আর তার পরিবার সে রাতের জন্য। সেদিন বাকি রাতটা সে ভগবানকে ধন্যবাদ জানিয়েছিল সে রাতটাই তার আর তার পরিবারের শেষ রাত ছিল না বলে। আর তার পরেই সেদিনের সেই মেয়েটা, আজকে যিনি মধ্যবয়সিনী নারী, বলে যাচ্ছিলেন, সে রাতের সেই ধন্যবাদের জন্য আজও কেন তিনি লজ্জায় মরমে মরে থাকেন। সে রাতের মিসাইলের ধাক্কায় তাঁর পরিবার রক্ষা পেয়েছিলো ঠিকই, কিন্তু মিসাইলের ধাক্কায় মাটিতে মিশে গিয়েছিলো তার সাত বছুরে ভাইয়ের প্রাণের বন্ধুর বাড়ি। সাথে সাথে বাড়ির বাসিন্দারাও। ভাইয়ের বন্ধু এবং তার বাবা বাড়ি এবং বাড়ির আর সমস্ত কিছুর সাথে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিলেন সেদিন। তারপর আরো আরো কত মানুষ, আরো কত কত কাছের পরিবার চোখের সামনে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো। একের পর এক যুদ্ধে ঘরছাড়া হলো আরো কতজন। সুন্দর সাজানো শহর ছারখার হয়ে গেল মানুষের তৈরী করা সমস্যায়। বলতে বলতে রাগে, লজ্জায়, হতাশায় কেঁপে উঠছিলো সেদিনের সেই মেয়েটা। নিজের দেশ ছেড়ে তাকে উদ্বাস্তু হতে হয়েছিল শুধু বেঁচে থাকার জন্য। তিরিশ বছর আগেকার ইরাকে সেদিন বেঁচে থাকাটাই দুষ্কর ছিল সাধারণ মানুষের। অথচ সে দিনের সেই মেয়েটি তো সাধারণ ছিল না। তার তো নিরাপত্তার অভাব হবার কথা ছিল না। তবুও তো তাকে জীবনের প্রথম উনিশটা বছরের শৈশব, কৈশোর, পরিবার, স্বজন, বন্ধু, সমস্ত জীবনটাই সেখানে ফেলে রেখে ঘর ছাড়তে হয়েছিল। ইরাকী রাষ্ট্রযন্ত্রের অত্যন্ত কাছের একটি পরিবারের একজন হয়েও তার নিজের দেশ তাকে নিরাপত্তা দিতে পারেনি। পালিয়ে আসতে হয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। এহেন মেয়ের মনে যে যুদ্ধ একটা বিশেষ স্থান দখল করে থাকবে তা অস্বাভাবিক নয়। ইরাকের মাটিতে বারংবার যুদ্ধ তাকে নিশ্চিন্ত উচ্চকোটির জীবনযাপন থেকে একধাক্কায় টেনে এনে বসিয়েছে যুদ্ধবিধ্বস্ত ইরাকী উদ্বাস্তুর জীবনে। সে মেয়ের শয়নে স্বপনে জাগরণে সেদিন থেকে তাই কেবল যুদ্ধ।

উনিশ বছর বয়সে কলেজের পড়া ছেড়ে মেয়ে চলল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। একা নয় মা-বাবার সাথেই। মায়ের জেদে মেয়েটাকে বসতে হলো বিয়ের আসরে। বাবার প্রচন্ড আপত্তি সত্ত্বেও, সে মেয়ে বিয়ে করল। বিয়ের কয়েক ঘন্টা আগে হবু বরের সাথে চুক্তি হলো তার। ইরাকের বর্তমান পরিস্থিতিতে তাকে নিয়ে পালিয়ে এসেছেন তার পরিবার। তাকে বিয়ে দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে রেখে সুস্থ স্বাভাবিক পড়াশুনা চালিয়ে যাবার জন্য এখানে এসেছেন। সুতরাং সে পড়াশুনা করবে, যা করতে চায় জীবনে তাই সে করবে। এই শর্তে বিয়ে করল সে, উনিশ বছরের মেয়ের বিয়ে নিয়ে, নববিবাহিত জীবন নিয়ে যা যা স্বপ্ন কল্পনা থাকা সম্ভব তার কিছুমাত্র ছিল না এই বিয়েতে। তবুও সেদিনের সেই পাথর হয়ে যাওয়া মেয়েটির মা, যিনি ছিলেন মেয়েটির এত বছরের জীবনে সবচাইতে ভরসার স্থল, তিনি নিজের কলিজাকে সম্পূর্ণ অচেনা একজন মানুষের হাতে তুলে দিয়ে গেলেন ? কেবলমাত্র তাকে যুদ্ধের বাইরে একটা সুস্থ পরিবেশ দেবেন বলে। তিনিই ছিলেন মেয়েটির লোহার মত মনোবল অথচ শিশুর মতো সতেজ একটি জীবন গড়ে তোলার কারিগর। মেয়েটির মনে সেদিন কি চলেছিল কে জানে ? তারপরের সেই স্বল্প বিবাহিত জীবনের প্রতিটি সেকেন্ডে তার বিয়ের শর্তভঙ্গ হতে দেখে, মানিয়ে নিতে নিতে স্বাধীনচেতা একটি সদ্যযৌবনা মেয়ের আত্মা কোথায় তলিয়ে গিয়েছিল কে জানে ? পড়াশুনা হয়নি। কোনো কিছুর স্বাধীনতা তো দূর, মেয়েটির দাম্পত্যজীবন, যৌনজীবন সমস্ত কিছুই তলিয়ে গিয়েছিল এই পরিবারের পুরুষ তন্ত্রের, পরিবারতন্ত্রের পেষণে।

তখনও সে ভাবত একদিন সে ফিরবে তার সুন্দর অতীতের পরতে পরতে। কিন্তু মানুষের সহ্যসীমা পরীক্ষা করেন বোধহয় বিধাতা। পাথর হতে হতে বাকি ছিল বোধহয় তখনও। ততদিনে গালফ ওয়ার শুরু হয়ে গেছে। আর তার সাথে ছিন্ন হয়েছে মেয়েটির বাড়ির সাথে সমস্ত যোগাযোগ আর বাড়ি ফেরার স্বপ্ন। আর তার সাথে বেড়েছে তার দাম্পত্য জীবনের হতাশা।

দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে সমস্ত মানুষই তো শেষরক্ষা করার চেষ্টা করে। আর এ মেয়ে তো ভবিষ্যতের আগুন পেরিয়ে হেঁটে চলা ফিনিক্স। সেদিন রাতে বিছানায় ইরাকী রাষ্ট্রনায়কের একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে, তার নৃশংসতার বিরুদ্ধে সমস্ত ক্ষোভ, সমস্ত রাগ, সমস্ত প্রতি নৃশংসতা উগরে দিচ্ছিলো স্বামীটি এই ইরাকী মেয়েটির ওপর। প্রাণপণ বাধা দেওয়া সত্ত্বেও বিবাহিত স্ত্রী যখন, তখন তাকে ধর্ষণ করার অধিকার তো অলিখিতভাবে স্বামীটির ওপর বর্তায়ই তাই না ? আর উদ্ধত একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত দেশের থেকে অনেক দূরে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে যুদ্ধের বিরুদ্ধে, রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে ঘৃণা, ক্ষোভ, রাগ হতাশা উগরে দেবার রাস্তা তো ধর্ষণ ! বিপ্লবী বা সেনাদের দেশপ্রেমের সাথে ধর্ষণেচ্ছা যে সমানুপাতী তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। সারা পৃথিবীর সমস্ত দেশের সেনাবাহিনী এ কথার সাক্ষ্য দেবে। সুতরাং এই স্বামীটির যে নীতিগতভাবে এতটুকুও বিবেকে লাগেনি উনিশ কুড়ির এই অসামান্য সুন্দরী সদ্য বিবাহিত ইরাকী তরুণীটিকে সাদ্দাম হুসেনের প্রতিভূ মনে করে বিছানাতেই জবাই করার জন্য। এর পরে যদি যুক্ত হয় আরো একটি সত্য যে, সামনের মেয়েটি সাদ্দাম হুসেনের খুবই কাছের মানুষগুলির মধ্যে একজন, হুসেনকে 'কাকা' সম্বোধন করার মত কাছের, তাহলে তো তাকে একেবারে মেরে ফেললেও বোধহয় কারো কিছু বলার থাকে না। হ্যাঁ, মেয়েটি যেকোনো একজন ইরাকী উদ্বাস্তু ছিল না। তার বাবা ছিলেন সাদ্দাম হুসেনের ব্যক্তিগত প্লেনের পাইলট এবং যুদ্ধ পূর্ববর্তী ইরাকের সিভিল এভিয়েশনের মাথা। সুতরাং সেই সূত্রে সাদ্দামের প্রাসাদেরই অংশ ছিল তার পরিবার। আর সেই সূত্রেই ইরাকী একনায়ক সাদ্দাম হুসেন মেয়েটির 'অসড়' অর্থাৎ কাকা। আর সেদিনের সেই কুঁকড়ে যাওয়া মেয়েটিই আজকের আগুন, যিনি আজ নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান। যেইনাব সালবি (Zainab Salbi)।

যুদ্ধপূর্ববর্তী ইরাকে ইউরোপিয়ান ধাঁচে শিক্ষিত, স্বাধীন, উচ্চ নীতিবোধ সম্পন্ন, শিক্ষিত রুচির পরিবারে বেড়ে উঠেছিলেন যেইনাব। অর্থের অভাব ছিলো না উচ্চবিত্ত সেই পরিবারে কোনো দিনই। আর ছিল মায়ের থেকে পাওয়া অন্যায়কে সহ্য না করার কঠিন কিন্তু শান্ত-ধীর একটি জেদ। ইরাকে সময় বদলানোর সাথে সাথে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন চলে তাকে যেতেই হবে তার সাধের বাগদাদ ছেড়ে। কিন্তু এইরকম খাঁচার জীবন যাপন করতে জন্মাননি যেইনাব। প্রতি পদে ধর্ষিত হচ্ছিল তাঁর এতদিনের নীতিবোধ, রুচি, শিক্ষা। আর তার সাথে সাদ্দাম হুসেনের কাছের মানুষ হবার সাজা হিসেবে শুধু স্বামী নয়, প্রতিটি মানুষের বাঁকা ঘৃণা। সেদিনের সেই রাতে বিবাহিত স্বামীর দ্বারা নৃশংস ভাবে ধর্ষিত হতে হতে মন স্থির করে নিয়েছিলেন যেইনাব। আর নয়, এবার নিজের জীবন তাকে নিজেকেই তৈরী করে নিতে হবে। শরীর আর মনকে এক জায়গায় জড়ো করে প্রবল আঘাত করেছিলেন দুর্বিনীত লোকটির বিরুদ্ধে। তাতে যদিও জোয়ান লোকটির বিশেষ কিছুই হয়নি। কিন্তু অবাক হয়েছিল সে আঘাতটা আসতে দেখে। পাল্টা আঘাতটা আসতে পারে জানলে মানুষ আঘাত করবে কিনা দুবার ভাবে। আর সামনের প্রতিপক্ষ দুর্বল হলে মানুষ আঘাত করেই আনন্দ পায়। এতো সর্বৈব সত্য। সুতরাং এই পাল্টা প্রতিরোধ অপ্রত্যাশিত ছিল বলেই পৌরুষে লাগলো বেশি করে। এতটাই লাগলো যে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের অভিযোগে পরদিন সকালে পুলিশ এলো যেইনাবকে নিয়ে যেতে। স্বামীটি ভেবেছিলো, এতে করে বেশ ভয় দেখানো যাবে উদ্ধত মেয়েটিকে। কিন্তু মেয়েটিকে সে চেনেনি তখনও। সে মেয়ে তখন করণীয় ঠিক করে ফেলেছে। সমস্ত অভিযোগ বিনা কথায় মেনে নিয়ে মাথা উঁচু করে চলে গেল পুলিশের সাথে। কারণ, সেটিই সেদিন ছিল তার মুক্তির একমাত্র পথ। মায়ের পূর্বপরিচিত বান্ধবীর সাহায্যে পুলিশি ঝামেলা মিটিয়ে নিজের যতটুকু দামি গয়নাগাঁটি ইত্যাদি ছিল সে সমস্ত গুটিয়ে ঘর ছাড়লো সে মেয়ে। পথে নামলো রাজার দুলালী। বাড়ির সাথে যোগাযোগ তো আগেই ঘুচেছে। গালফ এর যুদ্ধ তখন তুঙ্গে।

যার কোনো দিন এতটুকু অর্থের অভাব ছিল না, তারপর সে কি করে ওয়াশিংটনে পালিয়ে এসে মাথা গোঁজার ঠাঁই

জোগাড় করল, কি করে নিজের খরচ চালাবার জন্য কি কি কাজ করল, কি করেই বা পড়াশুনা চালালো সে এক রুদ্ধশ্বাস রূপকথার গল্প। প্রতি পদে বাধা। কিন্তু যে মেয়েটি আজকের যেইনাব হয়ে উঠবেন সে মেয়েকে আটকে রাখতে বিধাতাও ভয় পাবেন বোধহয়। তবে এবার আর ভুল করেনি মেয়েটি। তার পরিবারের পরিচয়, সাদ্দাম হুসেনের সাথে তার পরিবারের সম্পর্ক সম্বন্ধে ঘুণাক্ষরেও কাউকে কিছু জানায়নি তার নতুন দুনিয়ায়। নয়ত, নতুন করে বাঁচতে চাওয়া এই পৃথিবীতে আবার তার প্রতি সকলে ছুঁড়ে দিত ঘৃণা। আর চিরকালীন সেই "পাইলটের মেয়ে" এই অভিধা পেরিয়ে নিজস্ব ব্যক্তিস্বত্তাকে কাউকেই চেনাতে পারত না মেয়েটি। আজকের যেইনাবের জায়গা জুড়ে রাজত্ব করত "পাইলটের মেয়ে"। আস্তে আস্তে শুকিয়ে আসছিলো ক্ষতটা। প্রাণোচ্ছল মেয়েটি পরিণত হয়েছিল ভয়ার্ত, সংবেদনশীল একটি মূর্তিমতি হতাশায়। কোনো পুরুষকে বিশ্বাস করা সম্ভব ছিল না সেদিন তার। তবুও প্রেম আসে। তবুও প্রেম এলো। বিশ্বাস ভাঙতে ভাঙতেও মানুষ আবার বিশ্বাস করে। আমাদের এই মেয়েটিও বিশ্বাস করার মত আর একটি মানুষ পেল। আমজাদ আতাল্লাহ। আমজাদের বন্ধুত্বে কোনো খাদ ছিল না। স্বদেশ বিচ্ছিন্না, ক্ষতবিক্ষত মনের, কুড়ি বাইশ বছরের যেইনাবের জীবনে প্রেম এলো অবশেষে।

এত কিছুর মধ্যেও যুদ্ধকে ভোলেনি মেয়েটি। যুদ্ধ তার সব কিছু নিয়েছে। তার পরিবার, তার স্বজন, তার স্বদেশ। তাকে ভিটে ছাড়া করেছে নৃশংসভাবে হাজার হাজার উদ্বাস্তুর সাথে সাথে। Women for Women International তৈরী হলো যখন, মেয়েটির বয়স তখন মাত্র তেইশ। যে বয়সে মেয়েরা স্বপ্নের ডানার ভর করে স্বপ্নের দুনিয়ায় বাসা বাঁধে, সে বয়সে মেয়েটি স্বেচ্ছায় কাঁধে তুলে নিলো যুদ্ধ বিধ্বস্ত চুড়ান্ত অবহেলিত, কিন্তু চুড়ান্ত বাস্তব এক দায়িত্ব। আর সেখান থেকেই শুরু হলো আজকের যেইনাবের যাত্রাপথ। পাথর থেকে আগুন হয়ে ওঠার সূচনা। আগুনে সেই মেয়ে তারপর হেঁটে যেতে লাগলো যুদ্ধবিদ্ধস্ত একের পর এক দেশে। আফগানিস্তান থেকে সুদান থেকে কঙ্গো থেকে রোয়ান্ডা থেকে ইউক্রেন কোথায় নয় ! কোথাও বিপ্লবী কোথাও অন্য দেশের সৈনিক উদ্দাম অত্যাচার চালাচ্ছে মেয়েদের ওপর। যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির কথা বর্ণনা করতে গিয়ে উঠে আসে আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির কথা। উঠে আসে অসংখ্য সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। কিন্তু উহ্য থেকে যায় একটা বিশেষ অংশের কথা। যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় সবচেয়ে বেশি কিন্তু যুদ্ধের মধ্যেও যারা জীবনকে বাঁচিয়ে রাখে তারা কিন্তু এই অংশই।

মেয়েরা।

যেইনাব তুলে আনেন তাঁদের কথা, যাঁরা বছরের পর বছর যুদ্ধবন্দী যৌনদাসীরূপে সেনাদের লালসার শিকার হন আবার তাদেরই জল, খাবার-দাবার, গোলাবারুদ বয়ে নিয়ে যেতে বাধ্য হন। ভাসা ভাসা দেশপ্রেমের ধ্বজাধারীদের গালে সপাটে একটা থাপ্পড় কষিয়ে যেইনাবের অভিজ্ঞতা আমাদের শেখায় – "'শান্তি' মানে যুদ্ধের শেষ নয়, 'শান্তি' মানে জীবনের শুরু।" কেমন জীবন জানেন ? এই যে আমি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে বসে কিবোর্ডে কটা শব্দ টাইপ করে যুদ্ধবিধ্বস্ত নারীদের জন্য ছদ্ম হা-হুতাশ দেখাচ্ছি সেরকম লতানে জীবন নয়। শুধু ঋজু হয়ে বেঁচে থাকা। প্রতিদিনের খাওয়া পরা, স্কুল, কলেজ, হাসপাতালকে চালু রাখা। বোমা পড়লে বাচ্চাদের আগলে রাখা। তাদের মনে ভয় আর প্রতিহিংসার বীজ অঙ্কুরেই বিনিষ্ট করার চেষ্টা করে যাওয়া। এটাই তাঁদের জীবন। এটাই তাদের কাছে শান্তি। যেইনাব সংগ্রহ করেন এদের গল্প আর নির্মম উলঙ্গ সত্যিগুলো আমাদের ড্রয়িং রুমে ছড়িয়ে দিয়ে যান তার লেখায়, বক্তব্যে। দেশপ্রেম আর যুদ্ধের নায়কচিত গল্পের আড়ালে আসল রক্তাত সত্যটাকে আমাদের খাবার টেবিলে সাজিয়ে দেন। কি করবেন তখন ? বীভৎষতার, নৃশংসতায় বমনোদ্রেক হবে আপনার ? সেজন্য যেইনাব বলেন সে গল্প ? না। অবশ্যই সেজন্য নয়। তিনি বলেন জীবনের গল্প। তিনি বলেন তাদের কথা, যা জানলে আপনি নিজেকে আর ততটা অসহায় মনে করবেন না। যেইনাবের গল্প থেকে কটা গল্প শোনাই বরং।

আপনি জানেন, ইরাকে যখন মুহুর্মুহু বোমা পড়ত যেইনাবের ছোটবেলায়, যেইনাবের মায়ের মত অসংখ্য ইরাকী মা যেইনাব আর তার ভাইয়ের মত অসংখ্য ছোট ছোট বাচ্চাদের বুকের কাছে বসিয়ে পুতুলনাচ দেখাতেন ? যাতে তারা

বোমার শব্দের মাঝেও জীবনকে আগলাতে শেখে। যাতে তাদের কাছে বোমার শব্দটাই তাদের একমাত্র ছেলেবেলার স্মৃতি না হয়ে থাকে। আপনি কি চেনেন ফরিদাকে ? সৌদি আরবের এই অত্যন্ত সাধারণ রমণীর হয়ত খাতায় কলমে যুদ্ধে তাদের দেশকে রক্ষা করার কোনো রেকর্ড নেই। কিন্তু এই অসাধারণ রমণীকে চিনে রাখুন। বাচ্চাদের স্কুলের মিউজিকের শিক্ষিকা ইনি। পুরো যুদ্ধের সময়টায় একটা দিনের জন্য, হ্যাঁ, একটা দিনের জন্যও স্কুল বন্ধ করার কথা ভাবেননি। বোমার ভয় অগ্রাহ্য করে বাচ্চাদের উৎসাহ দিয়েছেন পিয়ানো আর অর্কেস্ট্রায়। বুকের খাঁচা সোজা করে রুখেছেন যুদ্ধের ভয়কে, বাচ্চাদের মনে ঢোকার আগেই। যেমন তেমন করে নয়, যথাযথ ফরম্যাল পোশাক, হ্যাট, গ্লাভস পরে আনন্দ করে বাজাতে শিখিয়েছেন বাচ্চাদের। পুরো যুদ্ধের সময়টাতেই। বাচ্চাদের জীবন সচল রেখেছেন।

আর সেই প্যালেস্টিনীয় মহিলার গল্প শুনিয়েছেন যেইনাব। বহুদিন পরে একদিন সামান্য সময়ের জন্য সিজ ফায়ার হলেই যিনি সাথে সাথে ছুটে যান বাজারে। কিনে আনেন ফুল। যতখানি সম্ভব। বেক করেন কেক। যতগুলি সম্ভব। তারপর সানন্দে বিলি করেন পাড়া প্রতিবেশীকে। শুধু এইটুকু মনে করিয়ে দিতে যে, আজ এই মুহূর্তেই সিজ ফায়ার অর্ডার উঠে গিয়ে আবার বোমা বর্ষণ শুরু হলেও তার অন্তরে জীবনের সুরটা কোথাও মিলিয়ে যায় না। অন্তরসলীলা হয়ে বয়েই চলে।

যেইনাব মনে করিয়ে দেন আরো একজন মায়ের কথা। কঙ্গোলিজ এই সাধারণ মহিলা অসাধারণ হয়ে ওঠেন যখন রাষ্ট্রবিপ্লবের শেষে women for women এর প্রচেষ্টায় তিনি ভোকেশনাল ট্রেনিং পান। ছোট ছোট বাচ্চাদের নিয়ে নতুন বাড়িতে যুদ্ধের ভয় কাটিয়ে মাথা উঁচু করে নিজের খাটুনির রোজগারে বাঁচতে শেখেন তিনি। তবুও কোথাও একটা অতৃপ্তি তাড়া করে চলে তাঁকে। ভয় হয় বাচ্চাদের নিয়ে। ওদের মনে কোথাও ঘৃণা, দ্বেষ তৈরী হচ্ছে নাতো ? চোখের সামনে তারা তাদের মাকে, বোনকে রাষ্ট্রবিপ্লবীদের দ্বারা ধর্ষিত হতে দেখেছে। বাবাকে আর নয় বছরের ছোট ভাইকে নৃশংসভাবে খুন হতে দেখেছে। বড় হয়েও তারা যদি প্রতিহিংসার প্রতিযোগিতায় নামে ? সারা ছেলেবেলা জুড়ে কেবলই ঘৃণা পুষে রাখে ? তাহলে তো এই যুদ্ধ কোনোদিন শেষ হবে না। চলতেই থাকবে বংশ পরম্পরা জুড়ে। তাই সে মা নিজে সব কিছু ভুলে হাসতে শেখে। আনন্দে পালা-পার্বনে নাচে পর্যন্ত। কেবল বাচ্চাদের মনে একটি সুন্দর ছোটবেলার স্মৃতি রোপন করার জন্য। যেইনাব তুলে আনেন এই মহিয়সী মায়ের কথা। বিশ্বশান্তির বিরাট নামডাকওয়ালা মহোৎসভায় এই নিরক্ষর যুদ্ধবিধ্বস্ত ধর্ষিতা মায়ের ভূমিকা ঠিক কি একটু ভাবতে বলেন আমাদের।

যেইনাব তুলে আনেন সুদানের সেই মেয়েটির কথা। যার কাছে 'শান্তি' মানে – তার পায়ের নখ বাড়াতে পারা। বুঝলেন না তো ? আমাদের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। বলছি বুঝিয়ে। যুদ্ধের পর যুদ্ধে যৌনদাসী হিসেবে ধরা পড়েছে সুদানী এই মেয়েটি। দিনের পর দিন সেনাদের সাথে পায়ে হেঁটে তাকে পেরিয়ে যেতে হয়েছে মাইলের পর মাইল পথ তাদের ভারী জিনিসপত্র বয়ে। এক দুই বছর নয়, কুড়িটি বছর। দুই দশক। ভাবতে পারেন ? ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে তার পা। পাথরের ধাক্কায় চলতে চলতে রক্তাত হয়ে ক্ষয়ে গেছে পায়ের আঙুলের নখ। যেইনাব তুলে এনেছেন সে মেয়ের গল্প যার কাছে 'শান্তি' মানে পায়ের নখ বাড়তে পারা। তাকে স্বনির্ভর করেছেন। তার পায়ের নখের পরিপ্রেক্ষিতে ভাবতে শিখিয়েছেন আমাদের যুদ্ধকে। যাতে গল্প, সিনেমাতে যতই যুদ্ধকে মহিমান্বিত দেখানো হোক না কেন, যেইনাবের সাথে সাথে আমাদের ভাবতে অসুবিধা না হয় যে, যুদ্ধ ভয় ছাড়া আর কোনো কিছুরই জন্ম দেয় না। আর কিচ্ছু না। আর সে ভয় বিশ্বজনীন। সেখানে একজন কঙ্গোলিজ মায়ের সাথে সুদানি মায়ের বা ভিয়েতনামি মায়ের বা আফগানী মায়ের কোনো তফাৎ নেই। প্রতিদিন মরতে মরতে তারা তবুও প্রাণপণে চেষ্টা করে যাচ্ছে উত্তর প্রজন্মের মধ্যে থেকে হিংসা-দ্বেষ-ভয়কে সমূলে ধ্বংস করার। যদিও যুদ্ধ মানে রাষ্ট্রনায়ক আর বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ রক্ষা। তবুও এর চাইতে কার্যকরী দীর্ঘমেয়াদী বিশ্বশান্তির পদ্ধতি কিছু আছে কি ?

যেইনাব আমাদের শোনান যুদ্ধবিধ্বস্ত রোয়ান্ডার সেই মেয়েটির কথা। বিধ্বংসী বোমা বর্ষণের পরের দিন যেইনাব সেখানে রোজকার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে Women for Women International এর কর্মীদের নিয়ে যখন সেখানে গিয়ে পৌঁছান এবং জিজ্ঞাসা করেন আর এক্ষুনি কি কি লাগবে তাদের, মেয়েটি নির্দ্বিধায় উত্তর দেয় – "একটা লাল টুকটুকে

লিপস্টিক।" অবাক হচ্ছেন ? ভাবছেন এ কেমন বায়না ? কিন্তু যুদ্ধের ধূসরতায় রং টাই তো একমাত্র কম পড়ে তাইনা ? যুদ্ধের ভয়াবহতায় যেখানে কয়েক মুহূর্ত পরে বেঁচে থাকবো কিনা এটাই একমাত্র প্রশ্ন, সেখানে বর্তমানকে সাজিয়ে আনন্দে বেঁচে নেওয়াটাই তো জীবন। যেইনাব আমাদের শেখান যুদ্ধশান্তির জন্য এই নিরক্ষর, ধর্ষিতা, মেয়েদের এই অনমনীয় তীব্র বেঁচে থাকা শুধু নয় জীবনকে যুদ্ধের ওপরে তুলে চিবুক উঁচিয়ে বাঁচার স্পর্দ্ধা কতটা জরুরি।

যেইনাব তাদের Women for Women International এর আওতায় এনে সম্মানের সাথে বাঁচার রাস্তা দেখিয়েছেন ঠিকই। কিন্তু আমাদের সাথে তাদের গল্প ভাগ করে নেওয়ার ফাঁকে নির্দ্বিধায় এটা স্বীকার করে নিয়েছেন, এই মেয়েরা তাঁর আজকের যেইনাব হয়ে ওঠার পেছনে কতবড় ভূমিকা পালন করেছে। তিনি এদের সত্য প্রকাশ করতে গিয়ে বুঝেছেন, জীবনের সত্যিকে গোপন করার মধ্যে কোনো মহিমা নেই। এরা যদি পারে, তিনি কেন গোপন করবেন তাঁর জীবনের মর্মান্তিক সত্যিকে ? এতদিন পর্যন্ত সাদ্দাম হুসেনের সাথে তার পরিবারের সম্পর্ক সযত্নে গোপন রেখেছিলেন যেইনাব। ততদিনে ইরাকে যুদ্ধ শেষ হয়েছে। ইঁদুরের গর্তে মৃত্যু হয়েছে সাদ্দাম হুসেনের। একনায়কতন্ত্রের অবসান হয়েছে। কিন্তু সাদ্দামের প্রতি সার্বজনীন ঘৃণা আজও এতটুকু কমেনি পৃথিবীর। আর সেই ঘৃণা একদিন তছনছ করে দিয়েছিল যেইনাবের দাম্পত্যজীবন। সার্বজনীন সেই ঘৃণা আর অগ্রহণযোগ্যতার ভয়ে আর "পাইলটের মেয়ে" পরিচয়ের আড়ালে হারিয়ে যাবার ভয়ে তরুণী যেইনাব লুকিয়েছিলেন তাঁর পরিচয়। কিন্তু আজ এই আক্ষরিক অর্থেই ধ্বস্ত মেয়েরা বারংবার তাঁকে সাহস যোগালো তার জীবনের সত্য পরিচয় দেবার। সেদিনের সেই ভয়ে কুঁকড়ে যাওয়া নির্বান্ধব যেইনাব নয়, আজকের যেইনাব লোহার মত কঠিন কিন্তু মায়ের মত কোমল। লৌহকঠিনতায় ভরা সভায় যিনি দাবি করেন শান্তিবার্তার দরদামের আসরে রাজনীতিবিদদের সাথে সাথে, সমাজ আর দেশ নিয়ন্ত্রকদের সাথে সাথে, পলিসি মেকারদের সাথে সাথে মেয়েদের আনতে হবে। আনতে হবে, ডাক্তার, নার্স, শিক্ষাবিদ আর সবাইকে যারা জীবনে বন্দুক ধরেননি। আনতে হবে তাদের যারা পিছনে থেকে যুদ্ধের ভয়াবহতাকে, প্রতিহিংসা পরায়ণতাকে তাঁদের পরবর্তী প্রজন্মে ছড়িয়ে যেতে দেননি। এক দুই জনকে নয়, দরদামের টেবিলের পুরো পঞ্চাশ শতাংশ। আবার সেই যেইনাব এই মেয়েদের কথা বলতে গিয়ে ভরা সভায় চোখের জল সামলান।

যেইনাব তার জীবন দিয়ে আমাদের শেখান স্বাধীনতা মানে একটি দেশের শাসনতন্ত্র একনায়কতন্ত্র থেকে গণতান্ত্রিকতায় পরিণত হওয়া নয়। স্বাধীনতা মানে স্ব-অধীনতা। নিজের সমস্ত কিছুর দায়িত্ব নিজে বহন করা। মাত্র তেইশ বছর বয়সে যে মেয়ে Women for Women International গড়ে তুলেছিলেন নিজের হাতে, তাকে সারা পৃথিবীর যুদ্ধবিধ্বস্ত মেয়েদের আশ্রয়স্থল বলে সংজ্ঞায়িত করছিলেন, সেই সংস্থার দায়িত্ব নির্দ্বিধায় ছেড়ে দিয়েছিলেন, কেবল অফিসিয়াল কাজের চাপে। যে কারণে এই সংস্থার প্রতিষ্ঠা, মেয়েদের কাছে পৌঁছানো, সেই কাজটি নিজে গিয়ে করতে পারছিলেন না বলে। একে যেইনাব ব্যাখ্যা করেছেন বিশ্বাসভঙ্গ করা বলে। তাঁর মনে হয়েছে, এর ফলে মেয়েদের কাছে বসে তাদের গল্প শুনে তাদের জীবনকে সম্পূর্ণ কাছ থেকে দেখে তাদের উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করার সেই সঙ্কল্পে সময় দেওয়া যাচ্ছেনা। Authenticity-র মানে নতুন করে সামনে এসে দাঁড়ায় যেইনাবের কথা শুনলে। তার লেখা পড়লে। তাঁর শান্ত-স্মিত মুখের পেছনে সংকল্পের দৃঢ়তা দেখলে মানবতায় ভরসা করতে ইচ্ছে করে। আমার মতন কাগুজে সহানুভূতি নয়, সত্যিকারের স্ব-অধীনতা। অন্তরের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী সেদিনের সেই মেয়েটির জন্য উঠে দাঁড়িয়েছে, উঠে দাঁড়াচ্ছে লক্ষ লক্ষ গুঁড়িয়ে যাওয়া মেয়ে সারা পৃথিবী জুড়ে। শিখে নিচ্ছে কাকে বলে অন্তরের স্বাধীনতা। শিখে নিচ্ছে "Freedom is an inside job", হয়ে উঠছে স্ব-অধীনা।

বিশ্বদীপ চক্রবর্তী

অনাহূত

মিশিগানে অনেক দেরী করে সন্ধ্যা নাবে, তাই ঘড়ির কাঁটা নটার ঘর পেরোলেও আকাশ থেকে চুঁইয়ে পড়া আলোয় বাইরেটা এখনো বেশ দেখা যাচ্ছে। নবেন্দুকে খুব সকালে অফিস বেরোতে হয় বলে খোদ অ্যামেরিকানদের মত সুচেতারাও সন্ধ্যে করেই ডিনার সেরে নেয়। গরমকালে প্রায় দিন বাইরের ডেকেই ডিনারের আয়োজন। পম ডিনার সেরে নিজের ঘরে অনেকক্ষণ, সুচেতা আর নবেন্দু তখনো ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নেবে আসা উপভোগ করছিল। এমন সময় সুচেতাই খেয়াল করল, এই দেখেছো ?

কি ?

ওই যে লোকটা রাস্তার সামনে তখন থেকে পায়চারি করছে –

নবেন্দু অন্যমনস্ক ছিল, আগে খেয়াল করেনি। তাদের আর ভিটালিদের বাড়ির প্রান্ত ধরে পায়চারি করছে লোকটা আর মোবাইলে কারো সঙ্গে হাত পা নেড়ে কথা বলছে। জবরদস্ত চেহারা, কালো। নবেন্দুর কোন অ্যাফ্রিকান অ্যামেরিকান বন্ধু নেই, আর ভিটালিরা তো সাদা। এই এলাকায় কি করছে লোকটা ? মনে এই প্রশ্নটা বুড়বুড়ি কাটলেও, উড়িয়ে দিতে চাইল নবেন্দু। রাস্তায় কে কি করছে, তাতে তোমার কি বলো তো ?

কাল্লুগুলোকে আমার একটু ভয় লাগে, সে তুমি যাই বলো।

কালো তো কি হয়েছে, আমিও তো কালো।

সেটাতো বাঙালি কালো। তোমার অমন গরিলার মত চেহারাও নয়।

বাঙালি ফরসা সুচেতার দিকে তাকিয়ে বিরক্ত প্রকাশ করল নবেন্দু, গরিলা শিম্পাঞ্জি যাই হোক, রাস্তায় আছে তোমার কি ?

দেখো ফোনে ওর বাডিদের আনাচ্ছে কিনা। বাইরে আর বসতে হবে না, ভিতরে চলো তো।

একরকম জোর করেই নবেন্দুকে ভিতরে নিয়ে গেল সুচেতা। সুচেতার চিন্তাটা এতক্ষণে নবেন্দুর মধ্যেও চাড়িয়ে গেছে। জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখছিল লোকটা কি করে। তখনো কথা বলে চলেছে। ধীরে ধীরে অন্ধকার নাবছে। লোকটা যেন সেই পশ্চাৎপটের সঙ্গে মিশিয়ে যাচ্ছে একটু একটু করে। এরপর তো কি করবে বোঝাও যাবে না।

জনকে একবার ফোন করে দেখো তো।

অনেক ফোন করেও যখন জনের ফোন এনগেজড আসল, ৯১১ ফোন করাই ঠিক মনে হল নবেন্দুর। সুবিধের লাগছে না লোকটাকে। ফোনে কথা বলতে বলতে ওর ঘনঘন মাথা নাড়া, রেগে গিয়ে হাত পা ছোঁড়া আর উদ্দেশ্যহীন ভাবে পায়চারি করাটা সত্যিই কেমন সন্দেহজনক।

এদেশে একটাই সুবিধা ফোন করার কয়েক মিনিটের মধ্যেই শেরিফের গাড়ি হাজির। সুচেতা বাড়িতেই রইল। নবেন্দু জুতোটা পায়ে গলাচ্ছিল, সুচেতা অফিস থেকে এসে ছাড়া ব্লেজারটা বাড়িয়ে দিল।

একি, শর্টস পড়েছি। তার ওপরে ব্লেজার? এর পর বলবে টাইটাও লাগিয়ে নাও।

ব্লেজার পড়লে একটা স্মার্টনেস থাকে। ভেবেই বলছি। পুলিশ এসে যাওয়ার পর অশান্ত মনে গর্জন তেলের প্রলেপ পড়েছে, সেই সমান্তরাল গলায় বলল সুচেতা।

শেরিফ গাড়ি দাঁড় করিয়ে লোকটার দিকে বন্দুক তাক করে হেঁটে যাচ্ছে, লোকটা কথা থামিয়ে মোবাইল শুদ্ধ হাত উপরে তুলেছে, নবেন্দু খোলা বন্দুকের সীমানায় যাবে কি যাবে না ভাবছে এই ছবিটার মধ্যে জনের গাড়িটা এসে ঢুকে গেল। গ্যারাজের মুখে বাঁক নিতে গিয়েও থমকে দাঁড়িয়েছিল জন। জানালা দিয়ে পথের বিভিন্ন চরিত্রদের অবস্থান দেখে ত্বরিত গতিতে জন দরজা খুলে নেবে আসল। হে স্যাম !

জনের আবির্ভাবে শেরিফের বন্দুকের নল মাটির দিকে নেবে আসছিল, কিন্তু স্যাম তখনো হাত উপরে করে দাঁড়িয়ে।

অফিসার, হোয়াটস আপ? বন্দুক দেখে জনও থতমত।

ইওর হাউজ ? ইউ নো দিস গাই ?

স্যাম, স্যামুয়েল স্নাইডার ইস মাই পাল।

ব্লেজারের মধ্যে নবেন্দু চুপসে যাচ্ছিল। সুচেতার জন্য কি একটা বিশ্রী পরিস্থিতিতে পড়ে গেল। অফিসার ততক্ষণে বন্দুক কোমরে গুঁজে জনকে বোঝাচ্ছিল কোন নেবারের ফোন কল পেয়ে তদবির করতে এসেছিল, আর কিছুই হয়নি। শুনতে শুনতে নবেন্দুর তখন ত্রিশঙ্কুর অবস্থা। সেই যে পুলিশ ডেকেছে সেটা বলবে না গাছের তদারকি করার ভান করে কিছুই জানে না ভঙ্গীতে মুখ ঘুরিয়ে নেবে ?

*** *** ***

ডিনার সেটিং

শীতের শেষবেলার বিষন্নতা মাখা একটা বিকেল। টুপটুপ করে সন্ধ্যা নেবে আসছে বন্ধ্যা গাছগুলোর শরীর বেয়ে। এই সময়ের গাছেদের বড় দীর্ণ লাগে সম্পূর্নার। শরীরের খোলস পড়ো পড়ো। দুএকগাছি বরফ কোথাও লেগে বা আছে, কিন্তু ভার নেই আর। দেবার মত বাকিও কিছু নেই আর। ভারমুক্ত গাছগুলো ডানা মেলে আছে নতুন সবুজের জন্ম চেয়ে।

সম্পূর্না এই সময়ে একটা একটা করে জানালার পর্দা টেনে দিয়ে থাকেন। বহুদিনের অভ্যাস। ছোটবেলায় যখন দমদমে বড় হয়েছেন, সন্ধ্যাবেলায় এই কাজটা ছিল তার। ঠাকুমা মালা জপতে জপতে হাঁক পাড়তেন, শম্পি, তাড়াতাড়ি জানালাগুলো এঁটে দে তো, না হলে ঝাঁকে ঝাঁকে মশা ঢুকবে ঘরে। রাতে আর শুতে হবে না, একেবারে উড়িয়ে নিয়ে যাবে সবাইকে।

ব্লুমফিল্ডের এই বাড়িতে জানালায় জানালায় মশা আটকানোর মিহি তারজালি ভেলক্রো দিয়ে আঁটা। পোকা মাকড় ঢোকার ভয় নেই। কিন্তু তবু ভারী পর্দা টেনে সন্ধ্যার অন্ধকারকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে পটাপট আলোগুলো জ্বেলে দিতে ভাল লাগে। শব্দহীন আলোকজ্জ্বল হয়ে ওঠে এক একটা ঘর। শোওয়ার ঘরে বিছানাটা পরিপাটি করেন। কুঁচকনো বাসী বিছানা চোখে টাটায়। প্রতিদিন সকালেই বিছানার চাদর পাল্টাবার অভ্যাস তার। তবু সেই পাট পাট বিছানায় একবার হাত বুলিয়ে অভ্যাসমত গায়ের কম্বলটাকে পায়ের কাছে নিখুঁত সাজুজ্যে গোছানো। চোখে ঘুম খুব কম। বিছানার পাশ ঘেঁষে বইয়ের ছোট তাকটাই তার রাতের ভরসা। বইগুলো একটু উল্টেপাল্টে নাড়ানাড়ি করে নিলেন একবার। কার্পেটে একটুও ধুলোর দানা উঁকি দিচ্ছে না দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে গেস্টরুমটায় ঢুকলেন। এদেশে ধুলো নেই অত, তার ঘরে অতিথিই বাঁ আর কে আসে আজকাল ? একসময় এই ঘরে মাঝে মাঝেই লোক থাকত। সুনীলবাবু থেকেছেন বেশ কয়েকবার। কোন অনুষ্ঠানে শহরে বাঙালি অতিথি আসলে, তার বাড়িতেই থাকতেন তারা। এতগুলো ঘরের সদ্ব্যবহার হত। এখন আর ওসব কোথায়। তবু সপ্তাহে একবার চাদর, বালিশ বদলে ফেলেন সম্পূর্না। কেউ যদি কখনো আসে অসুবিধা হবে না।

লম্বা বারান্দা দিয়ে এগিয়ে গেলে পাশাপাশি আরও দুটো ঘর। দুটোরই দরজা ভেজানো থাকে। জিনিষপত্রে ঠাসা এই ঘরগুলোর একটায় থাকত রকি, অন্যটায় কি কি। এই ঘর দুটোয় কোনকিছুই বদলাতে মন চায়না তার। সন্ধ্যার মুখে পারতপক্ষে এই ঘরে ঢোকেন না তিনি। কখনো সখনো নেড়ে চেড়ে দেখতে আসেন, কিন্তু সেসব সকালের দিকে। তখন সারা সকাল সেখানেই কেটে যায়। রাতের না ঘুম সময়ের দিকে থাবা বাড়াতে পারে না সেই নেড়ে ঘেঁটে দেখার মুহূর্তগুলো।

ঠিক সিঁড়ি দিয়ে উপরে ওঠার মুখে রাজস্থানী চৌকির উপরে রাখা লম্বা ফুলদানিটার কাছে এসে একবার থমকে গেল পা। সাদা গোলাপগুলো একটু ঘিয়ে আভা নিয়েছে, কালকে নতুন ফুল আনিয়ে বদলাতে হবে।

কাঠের সিঁড়ির রেলিং ধরে কার্পেটে আস্তে আস্তে পা দিয়ে নেবে আসছিলেন সম্পূর্না। হাঁটুতে চাপ পড়ে। তাই সোজাসুজি না নেবে শরীরটাকে একটু কোনাকুনি করে পাশ কাটিয়ে নাবতে হয়। অনেকদিন ধরেই। তার মায়েরও এই পায়ের ব্যামো ছিল। শাড়ি পড়ে কিভাবে যে ম্যানেজ করত মা!

সুইচে হাত পড়তেই আলোয় ঝলমল করে উঠল রান্নাঘর, লিভিং রুম। পোরটিকোর আলোয় ঝিরঝির করে বরফ পড়তে দেখল সমপূর্ণা। বেশি হবে না যদিও, ফোরকাস্টে তেমনটাই বলেছে। ছোটবেলায় বৃষ্টি দেখে মন নেচে উঠত, এখনো বরফ দেখলে খুব ভাল লাগে। রাস্তায় গাড়ি নিয়ে সেরকম আর বেরোতে হয় না, তাই বরফ পড়ার মজা নিতে পারে কোন দুশ্চিন্তার ভেজাল ছাড়াই। সন্ধ্যা হতেই ডিনার করার অ্যামেরিকান অভ্যাসটা অমরেশের সঙ্গে পঞ্চাশ বছরে রপ্ত হয়ে গেছিল, এখনো সেই অভ্যাস বজায় রেখেছে। বিশাল বড় শোকেসের সামনে দাঁড়িয়ে ভাবছিল কোন প্লেটটা নেবে। অসংখ্য ডিনার সেট সম্পূর্নার। একসময় অনেক অতিথি সৎকার করেছে, ডিসপোজেবল প্লেট কোনদিন পছন্দ ছিল না। এই ব্যাপারে একটা শৌখিনতা বরাবরের, এখনো আমাজন থেকে অর্ডার দিয়ে নতুন ডিজাইনের প্লেট আনান সম্পূর্না। তবে আজকাল শুধু দুটোর সেট। বেছে বেছে একটা হলদে সবুজ ড্রাগন আঁকা চাইনিজ ডিজাইনের প্লেট হাতে তুলে নিল। পাতলা প্লেটে খাওয়ার তৃপ্তিই আলাদা।

টেবিলে ম্যাচিং করে সবুজ সুজনি বিছালো এবার। লিব্বির কালেকশানের থেকে গ্লাস নিয়ে জলে বরফ ভাসিয়ে প্লেটের পাশে সাজিয়ে রাখল সম্পূর্না। রুটি ভাত কিছুই আর খায়না রাতে। পেঁপেসিদ্ধ আর অ্যাসপারাগাস, সঙ্গে কটা লেটুস পাতা। চারটে গ্রেপ টম্যাটোও, লাল, হলুদ আর বাদামী। সুন্দর করে সব খাবার প্লেটে সাজিয়ে তৃপ্তির চোখে তাকাল সম্পুর্না – বেশ ভাল রং ধরেছে সব মিলিয়ে। জানালার দিকে মুখ ঘোরানো চেয়ারটায় বসে জানালার বাইরে অন্ধকারের মধ্যে সাদা হতে থাকা পৃথিবীটা দেখতে দেখতে খাবারে কালো মরিচ ছড়িয়ে দিতে থাকে সম্পূর্না।

*** *** ***

বিদ্যাসাগরের মাথা

বৃষ্টিটা বেড়েই যাচ্ছে। রাস্তা শুনশান। যেসব দোকানগুলো রাত দশটার আগে ঝাঁপ ফেলে না তারাও আজ শাটার নাবাচ্ছে এক এক করে। দূরে ঘণ্টা বাজল দশবার। দূর থেকে মিলের ভোঁ সময়টাকে নিশ্চিত করে দিল। ঘন মেঘের আড়ালে আকাশের সব আলো মরে গেলেও চৌরাস্তার মোড়ে দাঁড়ানো বিদ্যাসাগরের ভেজা মূর্তি চারপাশ থেকে একটু আলো চুরি করে তার কৃষ্ণ অবয়বকে অন্ধকারেও জাগিয়ে রেখেছিল।

একটা মোটর সাইকেল চাকায় জল ছড়াতে ছড়াতে ঠিক মূর্তিটার নিচে এসে দাঁড়াল। আরোহীর মাথা থেকে পা পর্যন্ত রেনকোটে ঢাকা। মোটর সাইকেলের পাশ দিয়ে একটা লম্বা মই উপর দিকে উঠে গেছে। লোকটা এক পা মাটিতে রেখে প্রথম মইটাকে মূর্তির গায়ে হেলান দেওয়াল। তারপর অন্য পাটাকে ঘুরিয়ে মোটর সাইকেল থেকে নাবতে বোঝা গেল ওর পিঠে একটা ছোট বোঁচকা মত। স্কুলের ছেলেদের পিঠে ব্যাগের থেকে বড়, কাঁধ থেকে ঝুলে কোমর অবধি নেবে এসেছে।

লোকটা দুপাশে একবার মুখ ঘুরিয়ে দেখে নিল। কেউ কোথাও নেই সে ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে মইয়ের পাল্লা খুলে মাটিতে শক্ত করে দাঁড় করাল। যেভাবে মইটাকে ধরেছে বোঝা যায় এর উপরে ওঠার ভালই অভ্যাস আছে। ইলেক্ট্রিক মিস্ত্রীদের মত। এরপর ব্যাগটাকে ঘুরিয়ে সামনে এনে হাত ঢুকিয়ে একটা হাতুড়ি বের করে আনল। আস্তে আস্তে ধাপ বেয়ে বেয়ে উঠতে থাকল মই বেয়ে। লোকটা বেশ লম্বা। পাঁচ ধাপ ওঠার পরেই বিদ্যাসাগরের ঘাড় ছাড়িয়ে গেল ওর মাথা। এবার লোকটা আবার পিছনের ব্যাগটাকে সামনে আনল। এখন ওর কোন হাত মইতে ধরা নেই। লোকটা দু পা ফাঁক করে হাঁটুদুটো একটু ভেঙ্গে নিজেকে ব্যালান্স করছিল। বোঝা যায় অভ্যাস আছে। ব্যাগ থেকে একটা ছেনি বের করল বাঁ হাত দিয়ে। ডান হাতে ছিল হাতুড়িটা।

বিদ্যাসাগরের গলা কাধের যেইখান থেকে উঠেছে ঠিক তার গোড়ায় নিয়ে ধরল ছেনিটা। অন্য হাতে হাতুড়িটা বাগিয়ে প্রথম ঘাটা মারল। বেশী জোরে মারেনি। কিন্তু নিস্তব্ধতায় অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া চরাচর ঢনঢন শব্দে জেগে উঠল। কিন্তু জাগার মত কেউ ছিল না। তবু প্রথম ঘাটা মারার পর লোকটা একটু থেমেছিল। এর পরের ঘাগুলো ছোট কিন্তু ঘন ঘন আঘাতে নেবে আসতে থাকল। গ্রানাইটের মূর্তি। খুব একটা নরম পাথর নয়। তাই কাজ একটু ধীরে ধীরে এগোচ্ছিল। যেভাবে লোকটা মারছিল, মনে হয় মাথাটাকে অক্ষত অবস্থায় নাবাতে চাইছে। গলার ক্ষত বেশ কিছুটা গভীর হবার পর লোকটা হাতুড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে ট্যাপ করে দেখল মাথাটা নড়ছে কিনা। এখনো নড়েনি। লোকটার মুখের হাসিটা অন্ধকারে মিশে গেল। আবার একইভাবে ঠুকঠুক করে ছেনি দিয়ে বিদ্যাসাগরের শিরশ্ছেদের কাজ এগিয়ে নিয়ে চলল লোকটা।

প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে এমনি চলল। মাঝে মাঝে লোকটা মুখ ফিরিয়ে চৌরাস্তার চারদিক দেখে নিচ্ছিল। অন্ধকারে তেমন কিছু যে দেখা যাচ্ছে এমন নয়। কেউ যদি একান্তই এসে যায় নিজেকে যতটা পারে মূর্তির গায়ে মিশিয়ে দেবে এমনি প্ল্যান ছিল লোকটার। একটু রিস্ক থাকবেই। যখন হবে তখন দেখা যাবে, এমন একটা মনে ছিল। কিন্তু কেউ এলো না। মাথাটা এক সময় টুপ করে ওর বাড়িয়ে ধরা বাঁ হাতে বাতাবি লেবুর মত খসে পড়ল। লোকটা মইয়ের উপরে দাঁড়িয়েই এবার ব্যাগের মধ্যে ঢুকাল মাথাটা। হাতুড়ি আর ছেনি রেন কোটের পকেটে সেঁধিয়ে দিল। তারপর এক পা এক পা করে মই ধরে ধরে নিচে। মই টাকে ভাঁজ করে ডান হাত দিয়ে পাকড়িয়ে মোটর সাইকেলে উঠে ভটভট শব্দে চৌরাস্তা ছেড়ে শালিনী সিনেমা হলের পিছন দিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

বৃষ্টি এখনো ধরেনি। ঝমঝমে বষ্টির মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তার মাথা হারিয়ে চৌরাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। লোকটার নিজের ডেরায় পৌঁছাতে লাগল আরও মিনিটি পনেরো। একাই থাকে, দরজার চাবি হাতড়ে তালা খুলে ভিতরে এসে প্রথমেই পাথরের মাথাটাকে গামছা দিয়ে মুছল। ঘরের আরও অনেক হাত পা মাথার মধ্যে এক কোনে বসিয়ে দিল বিদ্যাসাগরের মাথাটাও।

লোকটার সমস্ত গতিবিধিতেই একটা নিশ্চিন্ততা, তাড়াহুড়া ছিল না কিছুতেই। সব কাজ সমাধা করে টানটান হয়ে বিছানায় শুতেই ঘুমিয়েই পড়ল বেশ, ঘুম ভাঙ্গল খুব ভোরে ফোনের শব্দে। হাত বাড়িয়ে ফোনটা কানে রাখল, চোখ তখনো বোঁজা।

শুনেছেন ?

কেন কি হয়েছে ?

আবার বিদ্যাসাগরকে অ্যাটাক করেছে। আগেরবার মুখে আলকাতরা দিয়েছিল, এবার আপনার বানানো মূর্তিটার মাথাটাই ভেঙ্গে নিয়ে গিয়েছে। বাঙ্গালির আর কি রইল বলুন ?

তাই, বেশ হয়েছে। বিদ্যাসাগরের মুখে চুনকালি তো আর লেপতে পারেনি এবার।

কি বলছেন আপনি ? আপনার নিজের সৃষ্টি এইভাবে কেউ ধংস করল, আর আপনি –

কি লাভ বল, দিনকাল ভাল নয় সুবিমল। প্রতিবাদ করে নেতাদের কোপে পড়ব নাকি ? মাথাটা তো বাঁচাতে হবে, মাথা গেলে মানুষের কি থাকবে বলো।

অন্য প্রান্তে সুবিমল অসহিষ্ণূ হচ্ছিল। বুড়ো হয়ে লোকটার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল, নাকি ভয়ে জুজু। নিজের শিল্প বাঁচানোর থেকে নিজের মাথা বাঁচাতে বেশী ব্যস্ত। অন্তত এর থেকে বেশী বাইট আশা করেছিলেন প্রবীন শিল্পীর কাছ থেকে। সকালের নিউজ আওয়ারের জন্য ক্যামেরা নিয়ে অরিন্দমকে পাঠাবে ভাবছিল, কিন্তু এরকম নিরাসক্ত শিল্পীর কাছ থেকে ব্রেকিং নিউজে দেওয়ার মত মশলা পাওয়া যাবে বলে মনে হল না। এর চাইতে ভাঙ্গা মূর্তির ছবি বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে দেখালেই বেটার।

সুবিমল ফোন ছেড়ে দিতে তপোধীর মিত্র বালিশ জড়িয়ে পাশ ফিরে শুলেন।

বিশ্বদীপ চক্রবর্তী — পেশায় ইঞ্জিনীয়ার, নেশায় লেখক। প্রধানত গল্পকার, ইদানীং নাটকও লিখছেন। গল্প প্রকাশিত হয়েছে দেশ, বর্তমান, সানন্দা, কথা সোপান, দুকুল এবং আরও পত্রপত্রিকায়, এবার বাতায়নে। মঞ্চসফল নাটক 'রণাঙ্গন' — এই বছরে বেশ কয়েকবার মঞ্চে এসেছে। ধারাবাহিক উপন্যাস 'হাগা সাহেবের ট্রেন' প্রকাশ পাচ্ছে 'অন্যদেশ' ওয়েবজিনে। থাকেন অ্যান আরবার, মিশিগানে।

সৌমিত্র চক্রবর্তী

কবিতার চরে একা

– "একদিনও বইমেলায় আসতে পারলেন না ? আপনার সঙ্গে আমার আড়ি।"

– "আড়ি ? তা বেশ। শুধু আড়াআড়ি বিভাজনটা না হলেই হল।"

– "এতো সুন্দর কথা বলেন আপনি, লেখেন। কেন নিজের প্রতিভাকে এভাবে চেপে রাখেন বলুন তো ?"

– "পাপ আর প্রতিভা – এ-দুটোকে চেপে রাখা কঠিনই শুধু নয়, অসম্ভবও। দ্বিতীয়টা আমার যখন প্রকাশ পাচ্ছেনা, তখন ওটা আমার কম আছে বলে ধরাই ভালো।"

– "যত্তসব উল্টোপাল্টা কথার চাষ ! আচ্ছা, সত্যিই নিজের চারদিকে এমন কুয়াশা কেন আপনার ?"

– "পাহাড়ে বেড়াতে গিয়ে মেঘ আর কুয়াশাকে প্রশ্ন করেছেন কখনও তোমাদের আড়ালে পাহাড় লুকোনো থাকে কেন ? ওটা কুয়াশার পরিচয়, স্বীকৃতি।"

– "আগামী সংখ্যাটার জন্য একটা কবিতা দেবেন তো ?"

– "দেব", নীল হাঁটতে শুরু করে ভীড়ের মধ্যে নিজেকে লুকোতে।

শিঞ্জিনি দাঁড়িয়ে থাকে তার ছোট্ট প্রকাশনা সংস্থার দিকে পিঠ করে। অপেক্ষা করতে থাকে পরবর্তী কবিতা পাওয়ার।

সে জানে, তার আর নীলের মধ্যে এই বিচ্ছিন্ন কবিতারাই জেগে থাকবে চর হয়ে, সেখানে কোনো গোটা গ্রন্থ ভেসে উঠবেনা কোনোদিন।

তপনজ্যোতি মিত্র

আকাশকুসুমের পৃথিবী

ঠিকমতো পার্ট মনে করে এসেছেন ত ?

ভালো করে চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলতে হবে, এইসব ছোট ছোট চরিত্রের অভিনয়ের ওপরে আমাদের নাটকের সাফল্য নির্ভর করে থাকে ।

উমা সে কথা ভাবতে ভাবতে আসছিলেন রিহার্সালে, এইভাবেই বলেন নাট্যনির্দেশক দিব্যদা ।

কখনো কি কোনো ছোট দুঃখ এসে দাঁড়িয়ে থাকে হৃদয়ের গভীর অরণ্যে ? কোনো ছোট হাহাকার ? কোনো কিছু না পাওয়ার বেদনা ?

সারা নাটক জীবন ত এইভাবেই থাকলো, কাটলো । ছোট, ছোট পার্শ্বচরিত্র, কখনো বা ছোট সংলাপ কয়েকটি, কখনো বা কথা নেই, শুধুই নীরব উপস্থিতি ।

ট্রেন এসে দাঁড়ায় শহরের ব্যস্ত স্টেশনে, উমা নেমে পড়েন, গলা শুকিয়ে উঠছে, একটু জল না খেলেই নয় ।

জল খেয়ে তারপর মৃদু পায়ে হেঁটে যেতে থাকলেন, মাঝে মাঝে ছেলে বাবুর কথা মনে পড়ছে, তাকে রেখে এসেছেন তাঁর বান্ধবী সাহানার কাছে ।

সাহানা এইটুকু সাহায্য না করলে নাটক করা হত না । কোথায় কার কাছে রেখে আসতেন বাবুকে ? বাবু সাহানার ছেলে দীপের সাথেই পড়ে, দীপের বন্ধু । সাহানা বাবুকে রাখে দীপের সাথী হিসেবে ।

উমার খুব দুঃখ হয়, আলোক চলে যাবার পর তিনি ভাবতেই পারেন নি কিভাবে তিনি সংসার চালাবেন, কিছু চাকরির চেষ্টা করেছিলেন, আশ্বাস মিলেছিল, কিন্তু বাস্তবে মেলে নি ।

হঠাৎ মনে হয়েছিল তাঁর ত অভিনয়ে দক্ষতা আছে, সেটাকেই কি কাজে লাগানো যায় ?

মফস্বল থেকে শহরে এসে নাটকের দলে জায়গা পাওয়া কঠিন । তবু তিনি চেষ্টা করে গেছেন, এক একটি দলে গিয়ে ধর্ণা দিয়েছেন ।

অনেকেই ফিরিয়ে দিয়েছিলো, সুযোগ দেয়নি । শুধু একটি জায়গায় সুযোগ মিলেছিল ।

সূর্যস্বাগত নাট্যদলের পরিচালক অভিদা একটি সুযোগ দিয়েছিলেন ।

সেই শুরু, তারপর মাঝে মাঝেই সুযোগ নানা নাট্যদলে – কিন্তু ছোট চরিত্রে ।

যাইহোক, কিছু পয়সা আসে ঘরে, আর করেন কিছু হস্তশিল্প । তাই দিয়ে কষ্টেসৃষ্টে চলে যায় দুজনের ।

ছেলের ভবিষ্যতের কথা ভেবে যে সংগ্রামের শুরু, সেই সংগ্রামই তাঁর পাথেয়, তাঁর শক্তি হয়ে রয়েছে ।

আজ তিনি সাথীমিলনী সংস্থার নাটকের রিহার্সালে আসছেন । দিব্যদা কড়া নির্দেশক – তাই পার্ট ঠিক মুখস্ত করে এসেছেন, তাও একটু ভয় জড়িয়ে থাকে মনে ।

রিহার্সালে এসে দেখলেন থমথমে পরিস্থিতি, কেউ কোনো কথা বলছে না ।

উমা বুঝতেই পারলেন না কি হচ্ছে । বুকটা কেঁপে উঠলো – তাহলে কি নাটক বন্ধ হয়ে যাবে ?

দুঃখের করুণ দিনগুলির কথা মনে পড়লো, যখন বাবু কোনো কোনো দিন অনাহারে কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়তো ।

নাটকের দলের সুশান্তর সঙ্গে কথা বলেন উমা । সুশান্তকে জিজ্ঞাসা করলেন – কি হয়েছে ভাই ?

সুশান্ত জানালো – নায়িকা মিতা পার্ট করবে না ।

মিতা পার্ট করবে না ? – চরম বিস্ময়ে উমা বললেন – নাটকের শো তো আর মাত্র তিন দিন বাদে ।

কি হয়েছে মিতার ? কেন করবে না ? – উমা জিজ্ঞাসা করলেন ।

– মিতা অন্য দলে যোগ দিয়েছে ।

– কেন ?

– সেখানে পয়সা বেশী ।

উমা মিতাকে জানতেন এক শিল্পী হিসেবে, তার শিল্পীসত্তা কিভাবে এটা করলো ?

বড় করুণ আবহাওয়ায ভরে আছে রিহার্সালের ঘর । সব তাল, লয় যেন ভেঙে পড়েছে । একটি ভেঙে যাওয়া সেতারের মতো পড়ে আছে গভীর বেদনা ।

দিব্যদা মাথা নীচু করে বসে আছেন । সব টিকিট বিক্রি হয়ে গেছে । এখন তিনি কি করবেন ? তাঁর কোনো দিশা নেই ।

তোমার মধ্যে আছে গভীর শক্তি – তোমাকে যত দেখেছি তত উপলব্ধি করেছি, তুমি ইচ্ছা করলে গড়তে পারো এক ভারী সুন্দর ঘর ।

উমার মনে পড়লো – তাঁকে আলোক বলতো এই ভাবে, তাঁর কোনো বিষাদের সময়ে হাতে হাত রেখে, গভীর প্রত্যয়ী উচ্চারণে ।

আলোককে হারানোর বেদনা গভীর হয়ে আছে, প্রতিদিন প্রতিরাত প্রতিমুহূর্ত আলোককে মনে পড়ে ।

আজ কি সেই আলোক আর একবার এসে দাঁড়ালো উমার জীবনে ? সেই প্রথম প্রেমের দিনের মতো, সেই ভালোবাসাময় দৃষ্টি নিয়ে ?

আলোক তাঁকে কুসুম বলে ডাকতো, আর তিনি আলোককে ডাকতেন আকাশ ।

আলোক কি বললো ? – এগিয়ে যাও কুসুম, তুমি পারবে ।

দিব্যদা – উমার ডাকে দিব্য চোখ তুলে তাকালেন ।

– দিব্যদা ।

– বলুন ।

– দিব্যদা, আমাকে একটা সুযোগ দেবেন ?

– মানে ?

– আমি কি মিতার রোলটা করতে পারি ?

– কি বলছেন আপনি, তিন দিন পরে নাটক, আপনি কি করে করবেন ?

আমি পারবো, উমা বললেন, যেন আলোক তাঁকে দিয়ে বলাচ্ছিলো, আমার এই নাটকের সবার পার্ট মুখস্থ ।

আপনি নাটককে এতটাই ভালোবাসেন ? বিস্মিত হয়ে বললেন দিব্য ।

নাটকের শোয়ের দিন যেন সারাক্ষণ আলোক সঙ্গে ছিল ।

সারা স্টেজ কি প্রবল অগ্নিশিখায় জ্বলে উঠেছিল? দ্রৌপদীর ভূমিকায় সারা স্টেজ ভরে উঠেছিল উমার অভিনয় মাধুর্যে, তাঁর গরিমায়, তাঁর আবেগে, তাঁর গভীর সৌন্দর্যে ভরা নাট্যমুহূর্তগুলি সৃষ্টিতে ।

দর্শকেরা কখনো আনন্দমুগ্ধ হয়ে উঠছিলো, কখনো তাদের চোখ থেকে ঝরে পড়ছিলো অশ্রু, কখনো বা তারা স্তব্ধ বিস্ময়ে বসে থাকছিল ।

নাটক শেষ হলে পর যখন উমা আর অন্যান্য শিল্পীরা মাথা নুইয়ে দর্শকদের অভিবাদন জানাচ্ছিলেন, সারা হলের দর্শক তখন উঠে দাঁড়িয়েছে, সমস্ত হল বারবার করতালিতে ভরে উঠছিলো ভালোলাগার বহিঃপ্রকাশে ।

দ্রৌপদীর অভিনয়ের ঘোর তাদের চোখে লেগে ছিল, তারা ভাবছিলো কী অপূর্ব নাটক, কি অসাধারণ অভিনয় ।

স্টেজের পেছনে একটি আলো অন্ধকার চেয়ারে বসে আছেন দিব্যদা, অঝোরে কাঁদছেন, উমা সেখানে এসে দাঁড়াতেই দিব্যদা তাঁকে নমস্কার করলেন। তারপর অবরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন – উমা দেবী, আপনি এখন থেকে সব নায়িকার ভূমিকায় থাকবেন ।

দিব্যদা তাঁর সাধ্যমতো দুহাত ভরে অর্থ দিয়েছিলেন, বলেছিলেন – আপনার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ, জানি অর্থে আপনার সম্মানের, আপনার শিল্পীসত্তার মূল্যায়ন হয় না, তবু এটি আপনার শিল্পশৈলীর স্মারক হয়ে থাক ।

অনেকদিন পরে বাবুর জন্যে একটু ভালো খাবার কিনেছেন উমা, আর একটি ভারী সুন্দর মালা ।

আলোকের ছবির সামনে দাঁড়িয়ে আছেন উমা, ছবিতে ঝুলছে সেই মালা, মালার সুগন্ধ জড়িয়ে রয়েছে আলোককে । আর উমার হৃদয় ভেসে যাচ্ছে গভীর আবেগে । চোখ থেকে ঝরে পড়ছে অনন্ত অশ্রুকণা ।

ছবির মধ্যে থেকে সেই মানুষটা যেন বলছিলো – চোখ থেকে অশ্রুজল মুছে ফেলো উমা, আজ ত আনন্দের দিন, দেখো দেখো এই ত আমাদের আকাশকুসুম পৃথিবী, সেখানে রেখো তোমার শিল্পসুষমা, তোমার প্রতিভার বর্ণালী, তোমার আবেগ ব্যঞ্জনা, আর সৃষ্টি করো এক নান্দনিক আলোকময় আনন্দভুবন ।

বাবু একসময় এসে উমার পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে, দেখছে তার হারিয়ে যাওয়া বাবার ছবিকে আর তার মমতাময়ী মাকে ।

জ্যোৎস্না প্লাবিত পৃথিবী কি কখনো ভেসে যায় গভীর অনুভবে ? ভালোবাসার রুদ্ধ দুয়ার কি খুলে যায় আবেগময়তায় ? পৃথিবী কি কোথাও গভীরভাবে বাঙময় হয়ে ওঠে ?

আকাশকুসুমের সেই পৃথিবী তখন কোথায় কখন যেন এক গভীর মায়াবী পৃথিবী হয়ে যাচ্ছিলো ।

তপনজ্যোতি মিত্র – সিডনির বাসিন্দা, পেশায় আই. টি. । কাজের শেষে প্রতিদিন বইয়ের জগতে ফিরে যান। রবীন্দ্রনাথ/জীবনানন্দ সহ বিভিন্ন লেখকের লেখা পড়ার মাঝে কখনো সখনো নিজেরও দু-এক লাইন লেখার বিনীত প্রয়াস। একটি গল্প 'বসন্তের জলাশয়ে প্রতিচ্ছবি' দখিনা পত্রিকায় প্রকাশিত। কবিতা আবৃত্তি ও গল্প পাঠের বাচনিক শিল্প করতে ভালবাসেন। এবং কখনো নাটকে অভিনয়, কখনো বা দেশ ভ্রমণ।

ইন্দ্রাণী দত্ত

বৌঠানের ছাদ

দিব্যি রোদ ছিল এতক্ষণ। নরম তরম মাঘমাসের রোদ কাঁধ থেকে ফুটপাথে পিছলে যাচ্ছিল-আমার চাদরের মত; সেফটিপিন আটকে বাড়ির থেকে বেরোলাম – মেট্রোর ভীড়ে খুলে পড়ে গেছে কখন যেন; আসলে, তাড়াহুড়োয় বড় সেফটিপিনটা খুঁজে পাই নি। সকালে রেডি হচ্ছি – মা কথা বলে চলছিল, ননস্টপ। বলছিল, অন্য একটা চাদর নিতে – শাল টাল। বলছিল, 'বড় বড় লোক আসবে। একটু ভালো জামা কাপড় তো পরলে পারিস, সেই এক ভুষো ভুষো শালওয়ার কামিজ, রোঁয়া ওঠা চাদর, সোয়েটার। কালও তো ওটাই পরে বেরোলি – আবার সিনেমায় গিয়েছিলি, তাই না ?'

এই আধা অন্ধকার ঘরে শুয়ে শুয়ে কীভাবে এত কিছু দেখতে পায় – কে জানে !

– 'বড় বড় লোক এলেই বা আমার কী ? তারা যেন আমাকে দেখতে আসছে ! সীতাপিসি, মাকে সকালের ওষুধটা দিয়ে দিলাম – দুপুর আর বিকেলেরটা দিও মনে করে। জলের ঢাকার ওপর রেখে যাচ্ছি, বুঝলে। আমি ন'টার মধ্যেই ফিরব। বিছানার চাদর আর বালিশের ঢাকাদুটো একটু বদলে দিও না গো, পিসি।'

এদিকে মা বকবক করেই যাচ্ছিল; দু'তিনবার কাশল – বেশ জোরে। সীতাপিসি রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে মা'র ঘরে গেল। মেঝেয় ওয়াকার ঘষটে চলার আওয়াজ – বাথরুম টাথরুম যাবে এবারে। টিফিনবক্সে রুটি আর বাঁধাকপির তরকারি ভরে আমিও বেরিয়ে পড়লাম। অটো নিয়ে কালিঘাটে এসে মেট্রো – তারপর গিরিশ পার্কে নেমে জোড়াসাঁকোর দিকে হাঁটছি। বাঁদিকে একটু ত্যারচা হয়ে টিংকু। মেট্রোর ভীড়ে দেখতে পাই নি। স্টেশন থেকে বেরোতেই সঙ্গ নিয়েছে। তারপর অবশ্য চিৎপুর রোডে আচমকা মেঘ করে এল আর টিংকুকেও খুঁজে পেলাম না; ফিরে আসবে একটু পরেই – রোদ উঠলে।

পাঁচ বছর বয়সে টিংকুকে প্রথম খেয়াল করি বড়জেঠুর ঘরে। লোডশেডিং ছিল। জেম্মা লণ্ঠন রেখে গিয়েছে; জেঠু বলল, 'হরিণ দেখবি ?' তারপর, বুড়ো আঙুল তক্তপোষের অনুভূমিক রেখে তার ডগায় তর্জনী ছোঁয়ালো, মধ্যমা ঠেকালো বুড়ো আঙুলের কড়ায় যেখানে উনিশ গুণি। আমাকে বলল – 'তুইও কর্'। লণ্ঠনের হলদে আলোয়, দেয়াল ক্যালেন্ডারের ঠিক নিচে বড় হরিণ আর ছোটো হরিণ। বড়জেঠু ছায়ার উৎপত্তি, আলোর অবস্থান এই সব বোঝাচ্ছিল। আমার তখন ছোটো হরিণের থেকে চোখ সরছে না – একটুখানি মাথা, সরু গলা – বড্ড রোগা, ভাত খায় না মোটে-ঠিক আমার মত। 'এই, বন্ধু হবি আমার ?'

নাম দিলাম-টিংকু। আমি রিংকু, ও টিংকু। তারপর বড় হ'লাম – স্কুল, কলেজ – টিংকুর কথা মনেই ছিল না। কতবছর পরে, বাবার কাজ সেরে পুকুরে যাচ্ছি একা-কী সব ভাসিয়ে টাসিয়ে দিতে হয়-দেখি পায়ের কাছে ছোটো বেঁটে একটু তালপাকানো টিংকু – 'তুই এত মোটা হলি কবে ? আর চলে যাস না। থাক আমার সঙ্গে।' টিংকুকে সঙ্গে নিয়ে বড় রাস্তা পেরিয়ে পুকুরে গেলাম-রাস্তায় পিক, থুতু, রাক্ষুসে লরি – সাবধানে হাঁটলাম সারাপথ – টিংকুর গায়ে যেন না লাগে।

টিংকুকে নিয়ে ওভাবেই হাঁটি। আলগোছে, ছোঁয়া টোঁয়া বাঁচিয়ে। আজও তাই। তারপর, মেঘ করল – একা একাই ঠাকুরবাড়ির গেটে এলাম। সেই কবে এসেছিলাম, স্কুলে পড়তে – বাবা ছিল। সামনেটা এখন বদলে গেছে – কত সব নতুন দোকান। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি। বাঁ দিকে খুঁটি পোঁতা, তাতে রঙীন কাপড় প্যাঁচানো, প্যান্ডেল, ফ্লেক্স ঝুলছে-লিটল ম্যাগাজিনের ছোটো ছোটো স্টল। লম্বা টেবিল। ওদিকে একটা স্টেজ। লোপাদি আর তনয়দা এখানেই দাঁড়াতে বলেছে। কলেজ স্ট্রীট থেকে বই নিয়ে আসবে – ওদের স্টল আছে এখানে। আমাকে টুকটাক কাজ করে দিতে হবে আজ – স্টলে বসা, বিক্রিবাটা সামলানো এই সব আর কি। একটা ছোটো কম্পানিতে কাজ করতাম, সামান্য চাকরি। আর গানের

টুইশানি। গতমাসে চাকরি গেল – মালিকানার হাতবদল হয়েছে না কি যেন। বাবার পেনশনের টাকা আর কতটুকু ! মা'র ওষুধ আর ডাক্তারেই চলে যায়। এই তো, সামনের সপ্তাহেই হাজার দশেক টাকা লাগবে মা'র টেস্টের জন্য – কীভাবে জোগাড় করব এখনও জানি না।

লোপাদি, তনয়দারা পাড়াতেই থাকে। লোপাদি পরশুই বলল – 'দু চারটে দিন আমাদের একটু হেল্প করে দিবি ?' টাকার কথা সরাসরি বলতে লজ্জা পাচ্ছিল; আমিও। তনয়দা পাশ থেকে বলল, 'বিনে পয়সায় খাটাবো না রে, প্রমিস।' সে তো জানি। কিন্তু ছোটোখাটো কাজের জন্য আর কটা টাকা পাবো ? সামনের সপ্তাহের মধ্যেই হাজার দশেক টাকা জোগাড় করতে হবে – যে করে হোক। এই কাজটা মিটে গেলে, লোপাদির থেকেই ধার চাইবো না হয়। কিম্বা বড়পিসি। এখনও বেঁচে। দেয় যদি কিছু। টাকার চিন্তায় যখন পাগল পাগল লাগে, তখন মনে হয়, আমি বোধ হয় কাকীদিদা হয়ে যাচ্ছি। কাকীদিদা আমার মায়ের কাকীমা – প্রথমদিকে সত্যি টাকার দরকার ছিল, পরের দিকে ছেলেমেয়েরা প্রতিষ্ঠিত, মা'কে তারা দিব্যি যত্নেই রেখেছে – তখনও দুপুরবেলায় বেরিয়ে পড়ত কাকীদিদা – বাসে চেপে, রিক্সায় এর বাড়ি তার বাড়ি – 'দিবি রে পঞ্চাশটা টাকা ? খুব দরকার। সামনের মাসেই দিয়ে দেব'। অদ্ভুতভাবে মারা গিয়েছিল। কাকীদিদার ছোটো বাড়ি – একতলাই ছিল, বহুবছর পরে ছাদে একখানা ঘর তুলেছিল। বড়মেয়ের বিয়ে হচ্ছিল সেই ছাদে; কে যেন বলেছিল, মেয়ের বিয়ে দেখতে নেই না কি – কাকীদিদা তাই ছাদের লাগোয়া ঘরেই বসে ছিল, ছাদের দিকে দুটো জানলায় পর্দা টানা। ওদিকে বিয়ের আসরে মালাবদল, শুভদৃষ্টির সময় ছবি তুলছে সবাই; হঠাৎই কাকীদিদার এক বোনপো 'একি একি মেজমাসি জানলায় উঠে কী করছ' বলে চেঁচিয়ে উঠতে কাকীদিদা জানলার রড ছেড়ে ঘরের মেঝেয় ধড়াম করে পড়ল। দু দিন হাসপাতালে। তারপর শ্মশানযাত্রার আগে মা কে নিয়ে গিয়েছি ওখানে-ফুল টুল নিয়ে; ধূপ জ্বলছিল-সাদাচাদরের তলায় নারীলক্ষণগুলি ঢাকা-আশ্চর্যজনকভাবে ক্লাইভ ওয়েনের মত লাগছিল কাকীদিদাকে – 'দ্য ইন্টারন্যাশনালে'র ক্লাইভ ওয়েন যেন। আগে কোনদিন এরকম মনে হয় নি। হয়ত আমার চোখের দোষ, অথবা বিশ্বায়নের কুফল আমাকে কব্জা করে ফেলেছিল – তনয়দা যেমন বলে টলে। তবে সত্যি, আজকাল আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে রোজই মনে হয়, আমিও কাকীদিদা হয়ে যাচ্ছি – চৌকো চোয়াল, কপাল চওড়া হচ্ছে দিনদিন, আর চোখের মধ্যে কেমন খিদে খিদে ভাব।

এদিকে প্রায় একটা বাজতে চলল – দাঁড়িয়ে আছি তো আছিই। বেশিরভাগ টেবিল এখনও খালি। লাউডস্পীকারে গান হচ্ছে। গানের না কি ট্রাফিকের আওয়াজে মোবাইল বাজছে বুঝি নি। উরুতে ঝোলা ব্যাগ ঠেকে যেতে থিরথিরানি টের পেলাম – মোবাইল বের করে দেখি, লোপাদি চারবার ফোন করেছিল।

– 'ও লোপাদি, সরি গো, ভেরি সরি। শুনতে পাই নি। গান হচ্ছে এখানে'।

– 'তুই কি পৌঁছে গেছিস ?'

– 'বারোটাতেই এসে গেছি'।

– 'শোন না, তুই একটু খেয়ে টেয়ে নে। খাবার এনেছিস ? আমাদের দেরি হবে রে। বিকেল হয়েই যাবে। প্রেসে আটকে গেছি।'

– লোপাদি, আমায় কিন্তু ন'টার মধ্যে ফিরতে হবে। সীতাপিসি চলে যাবে তো তারপর।'

– 'আরে না না অতক্ষণ আটকাবই না। তুই খেয়ে নে। একটু ঘুরে টুরে বেড়া। ঠাকুরবাড়ির ভেতরটা দেখে নে না পারলে। গিয়েছিস আগে ?'

ভিতরে ঢুকতে টিকিট কাটতে হয়। আমার ব্যাগে এখন সে'টাকাই নেই। দল বেঁধে লোক ঢুকছে দেখলাম – চটি, জুতো খুলে বাইরে রাখছে। বাঁদিকে দেবেন্দ্রনাথ, ডানদিকে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং লোকজনের ওপর খেয়াল রাখছেন। সামনে

অনেক ফুল টুল। আমি ঘাসে বসে রুটি বাঁধাকপির তরকারি খেয়ে আকাশ দেখছিলাম। ক'দিন আগে মাঘোৎসব গেছে – জোড়াসাঁকোর ছাদের ওপর আধখোলা সামিয়ানা উত্তুরে হাওয়ায় তোলপাড় হচ্ছিল। এই ছাদেই কি নতুন বৌঠানের বাগান ছিল ? কে জানে ? ওসব ভেবে কী বা হবে ! আমার ন'টার মধ্যে বাড়ি ফিরতে হবে, আগামী সপ্তাহের মধ্যে দশ হাজার টাকা চাই। তবু, ছাদের দিকেই চোখ যাচ্ছিল। আকাশে এখন সামান্য রোদ, মেঘও। ঢাউস সামিয়ানায় ক্রমাগত হাওয়ার ঢেউ খেলছে আর ছেঁড়া তেরপলের টুকরোটা কখনও বিশাল এক ঘুড়ি কখনও নৌকার পাল হয়ে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে কেমন একটা হচ্ছিল ভেতরে-সমুদ্রে অনেকক্ষণ স্নান টান করে হোটেলে ফিরেই একটু শুয়ে নিলে যেমন হয় – পিঠের তলায় টানটান বিছানা ঢেউএর মত হয়ে যায়, পায়ের তলায় অদৃশ্য বালি সরে সরে যেতে থাকে – চোখ বুজে থাকলে ঘরটাই সমুদ্র হয়ে যায় – অনেকটা সেইরকম। মনে হচ্ছিল, যেন আমি দোলনায় বসে, এবারে মাটিতে পা ঠুকে সামনের দিকে লম্বা করে বাড়িয়ে দিলেই হাওয়ার ঢেউ আমাকে তুলে নিয়ে যাবে ঐ উঁচুতে-সটান ছাদে। টিংকু আমার পায়ের পাশে শুয়েছিল। চিন্তাভাবনার তো ছায়া হয় না। টিংকুকে তাই খুব সরু, রোগা, গুটলি পাকানো মত লাগছিল। হঠাৎ ইচ্ছে হ'ল, রোগাভোগা টিংকুটাকে দোলনায় তুলে দিই। তারপর অই উঁচুতে বৌঠানের ছাদে পৌঁছে যাক টিংকু। সে তো আর কাকীদিদার বেখাপ্পা ছাদ নয়, বৌঠানের ছাদে রজনীগন্ধার বাগান থাকবে শিওর, শীতলপাটি তাকিয়া খাবার টাবার শরবৎ, আর থাকবে সুদর্শন যুবকের দল – লম্বা, কোঁকড়ানো চুল, জুলফি – তারা বেহালা বাজাবে, অথবা পিয়ানো; গান গাইবে। কেউ আবীরের মত, কেউ পরমব্রত, অথবা অনির্বাণ। কাল শাজাহান রিজেন্সি দেখেছি – এই নিয়ে দুবার। মা কী করে টের পেয়ে গেল কে জানে ?

টিংকুকে বৌঠানের ছাদে পৌঁছতে গেলে, আলোটা কোন দিক দিয়ে আসতে হবে? মাটি ফুঁড়ে ? নিজে নিজেই হাসতে লাগলাম।

(২)

– 'রিংকু না ? কী করছিস এখানে ?'

চমকে দেখি বুড়োদা দাঁড়িয়ে হাসছে। প্রথমে ছ্যাঁৎ করে উঠল সেই জায়গাটা যেখানে হাত দিয়েছিল বুড়োদা আমাদের পুরোনো বাড়ির সিঁড়ির ঘরে। চুমু খেয়েছিল। পরের সেকন্ডেই ভাবলাম-দূর সে সব বহুদিনের কথা –

আমিও হাসলাম, গলা খাঁকরে বললাম – 'এই তো একটু কাজে। ভালো আছ ?'

– 'এখানে কিসের কাজ তোর ? গান আছে লিটল ম্যাগের ওখানে ?'

মাথা নাড়লাম – হ্যাঁ না দুইই বোঝালো সম্ভবতঃ

– 'কী ভালো গাইতি তুই। আমার নয়ন ভুলানো এলে গেয়েছিলি পুজোয়, মনে আছে ?'

– 'সে সব কতদিনের কথা, বুড়োদা'

– 'মনে পড়ে আর কি – কেমন করে গাইতি অইটুকু ঐ মেঘাবরণ; কানে লেগে আছে এখনও। জানিস? তোর গান ক'টায় রে ? শুনব'

– ' সে তো হয়ে গেছে কখন'

– 'কই শুনলাম না তো – সকাল থেকেই তো স্টলে ছিলাম। ও আচ্ছা, একবার একটু বেরিয়েছিলাম। তখনই গেয়েছিস তাহলে। আমারই মন্দ কপাল। তো ? এখন কী করছিস মাঠে বসে ?'

আঃ বুড়োদা, সব সময় কৈফিয়ৎ দিতে হবে নাকি ?

জোর করে হাসি টেনে বললাম, 'এক বন্ধু আসবে। তাই অপেক্ষা করছি –'

– 'বন্ধুনী না বন্ধু, অ্যাঁ ? কী রে ? ডুবে ডুবে জল খাচ্ছিস ?'

উরুর ওপর আবার থিরথিরানি – 'অ্যাই রিংকু, আজ তুই বরং বাড়ি চলে যা। প্রেসে আরো ঘন্টা দুই থাকতে হবে, তারপর আর জোড়াসাঁকোয় যাওয়ার মানেই হয় না। কাল সকালে এক্কেবারে তোকে নিয়েই আসব। হ্যাঁ রে লোকজন কেমন হচ্ছে দেখলি ? প্রথম দিনটা একদম বেকার গেল – ধুস্।'

– 'রিংকু চা খেয়েছিস ? চল, চা খাই। তোর বন্ধু আসবে না – তাই বলল তো ?' শোনা যাচ্ছিল পাশ থেকে।

চা খাওয়ালো বুড়োদা। কেক।

– 'অনেকক্ষণ খাস নি, না রে ? শোন্ না, কলেজ স্ট্রীট যাবো একটু; আবার প্রেসে যেতে হবে। তুইও চল। ফেরার পথে শিয়ালদা থেকে সাউথ লাইনের ট্রেনে উঠে যাস। স্টেশন থেকে অটো নিয়ে নিবি।'

টিংকুর দিকে তাকালাম। সেও যেন বলল – চল।

আসলে যাই না তো কোথাও।

কলেজস্ট্রীটে ঘন্টাখানেক ঘুরে তারপর প্রেসে বসে আছি। অনেক কথা বলছিল বুড়োদা। নিজের কথা, চাকরির গল্প, ওদের এই নতুন ম্যাগাজিন, লেখালেখির কথা। মা'র খোঁজখবর নিল। আমার ক্লান্ত লাগছিল খুব। বললাম – 'বুড়োদা, তোমার কি আরো দেরি হবে ? আমি এবারে যাই, বুঝলে ?'

– 'যাবি ? দেরি হয়ে যাচ্ছে তোর ? আচ্ছা। শোন্, এই টাকাটা রাখ। শাড়ি তো হবে না, সাজগোজের কিছু কিনিস – কত কী পাওয়া যায় আজকাল। একটু ভালো জামাকাপড় পর, লিপস্টিক ঠিক মাখ। এভাবে থাকিস না' –

– 'না না বুড়োদা, ও তুমি রেখে দাও।'

– আরে আমারও তো দিতে ইচ্ছে হয়, জন্মদিনে, পুজোয় কতদিন কিছু দিই নি তোকে। আর শোন্, আসিস্ আমাদের বাড়িতে। তোর সিভি আনিস। বুঝলি ? কী করতে পারি দেখব। শনিবার করে আসিস। তোর বৌদি পুজো দিতে যায়। অনেকটা সময় কথা বলা যাবে।

টাকাটা বুড়োদার মুখে ছুঁড়ে দিয়ে চলে এলাম।

কলেজস্ট্রীট থেকে শিয়ালদা যেন গনগনে আগুনের ওপর দিয়ে হাঁটলাম। কান মাথা ঝাঁঝা করছিল। চোখ দিয়ে জল পড়ছিল অঝোরে – আগুনের শলা কানের এপার থেকে ওপারে পোঁছে যাচ্ছিল – এ'সবের তো ছায়াটায়া হয় না – আমার পায়ের কাছে এখন চার চারটে মোটা বেঁটে আহ্লাদী টিংকু। রাস্তার বাতি জ্বলে গিয়েছে।

ট্রেনটা গ্যালপিং ছিল – খেয়াল করি নি। নামলাম সোনারপুরে। উল্টোদিকের প্ল্যাটফর্মে থিকথিক করছে লোক-আপ ট্রেনের গন্ডগোল – অ্যানাউন্সমেন্ট হচ্ছে ঘন ঘন – ঘন্টাখানেক পরে অবস্থা স্বাভাবিক হ'তে পারে বলছিল। ব্যাগ থেকে

বোতল বের করে জল খেলাম – কী করব ? কী করব আমি এখন ? বেরিয়ে বাস ধরব ? কোন বাস যায় ? জিগ্যেস করব কাউকে ? বাসে খুব ভীড় হবে তো – উঠতে পারব ? এখনই তো প্রায় আটটা। শীতের রাতেও বিনবিন করে ঘাম হচ্ছে। চাদর খুলে কোমরে প্যাঁচালাম। মোবাইল বের করে সীতাপিসিকে বললাম – 'আটকে গেছি। চলে যেও না।' সীতাপিসি গজগজ করল, কেটে দিল ফোন।

নিজের ওপর রাগ হচ্ছিল। ঘেন্না। কেন গেলাম বুড়োদার সঙ্গে ? জল খেলাম আবার, তারপর একটা বেঞ্চে ঠেসে ঠুসে বসে রইলাম ট্রেনের অপেক্ষায় – পায়ের কাছে টিংকু – পুরোনো ডুমের হলদে আলোয় ম্যাটম্যাট করছে।

আধঘন্টা নাকি এক ঘন্টা বসে ছিলাম – খেয়াল নেই – হয়ত ঘুমিয়েও পড়েছিলাম, কে জানে ! গান ভেসে এল হঠাৎ – সেই সঙ্গে জ্যোৎস্না। মুখ তুলে দেখি, প্ল্যাটফর্মের একপাশে বেশ অন্ধকার – লোকজন গোল হয়ে দাঁড়িয়ে – কালো কালো মাথা, ছোটো বড় অবয়ব – রেলে কাটা পড়া লাশ দেখবার ভীড়ের মত অনেকটা; অথচ গান আসছিল সেখান থেকেই – এক প্যার কা নগমা হ্যায়। গলাটা চেনা লাগল – যেন অনেক আগে শুনেছি কোথাও, কানেক্ট করতে পারছি না। ঠেলে ঠুলে সামনে গিয়ে দেখি, মানুষের বেড়ায় ঘেরা এক বৃত্ত – তারই কেন্দ্রে উস্কোখুস্কো চুল, মলিন শাড়ি – গান গাইছে, পায়ের কাছে তানপুরার তম্বুরার মত ছায়া। পয়সা দিচ্ছে লোকজন। মোবাইলে ছবি তুলছে। মুখ দেখার চেষ্টা করছিলাম – ঠাহর করতে পারছিলাম না; খানিকটা কাকীদিদার মত লাগছিল আদল। সুরসমেত কথা ভেসে ভেসে আসছিল – এক প্যার কা নগমা হ্যায় – জিন্দগী আর কুছ ভি নহি তেরি মেরি কহানি হ্যায় – অন্ধকার অনেক পাতলা লাগছিল, ঘোলাটে আলোয় কেমন আবছা হয়ে যাচ্ছিল ভীড়ের আকার ও পরিধি; তারপর আচমকা প্ল্যাটফর্মের শেড আর মানুষের মাথার মাঝখানের ফাঁকটুকু দিয়ে সাঁৎ করে চাঁদ ঢুকলো স্টেশনে, আর যেন পায়ের তলা থেকে জ্যোৎস্না উঠে এলো সটান – বিশাল এক চাদর পাতল প্ল্যাটফর্ম জুড়ে। সিনেমার পর্দার মত। সেই পর্দায় সোনারপুর স্টেশন বালুচর হয়ে গেল প্রথমে – জ্যোৎস্নায় জ্যোৎস্নায় পুরো সাদা – ঢেউ ভেঙে ভেঙে আছড়ে পড়ছে – ভীড় টীড় মুছে সাফ – তারপর একটা ছাদ যেন – থই থই চাঁদের আলো, কিছু কাশ ফুটে ছিল, রজনীগন্ধার ঝাড় লকলক করছিল হাওয়ায়। সে'ছাদ, ছাদের পাঁচিল টাঁচিল স্বচ্ছ কাচ – প্রিজম নাকি অজস্র আয়না। এক আয়নায় আকাশ, অন্য আয়নায় সমুদ্র আর বালি আর তিন নম্বর আয়নায় বৌঠানকে দেখলাম স্পষ্ট – একবার খোঁপা আবার খোঁপা ভেঙে এলোচুল, ঢাকাই শাড়ি, গাঢ় রংএর শাল; পরক্ষণেই, যেন সিনেমার ওয়াইড অ্যাঙ্গল শট – আকাশে বৌঠান বাতাসে বৌঠান সাগরে বৌঠান বালিতে বৌঠান – তাকে ঘিরে বেহালা বাজায় আবীর, পরমব্রত পিয়ানো বাজিয়ে গায় – হৃদয়ে ছিলে জেগে; প্যার কি নগমার সঙ্গে তখন তার আশ্চর্য ফিউশন হতে থাকে। হাওয়ায় ওলোট পালোট খেতে খেতে বৌঠানের ছাদ পেল্লায় এক গালচে হয়ে যায় এবার – আমার দিকে স্ট্রেইট উড়ে আসতে থাকে – যেন তুলে নিয়ে যাবে।

না না না – আমাকে যে বাড়ি ফিরতেই হবে, সীতাপিসি ফিরে যাবে ন'টায়; ক'টা ? ক'টা বাজে এখন ? অবশ হয়ে আসে পা, থিরথির করছে উরু-মোবাইল বাজছে তো বাজছেই – সীতাপিসি ফোন করছে বারবার – ফোন তোল রিংকু, ফোন তোল – না না না – এক প্যার কা নগমা হ্যায় – হৃদয়ে ছিলে জেগে, দেখি আজ শরত মেঘে – কুছ খো কর পানা হ্যায় কুছ পা কর খোনা হ্যায় – কী যে গান গাহিতে চাই, বাণী মোর খুঁজে না পাই – এ'সপ্তাহে দশহাজার টাকা চাই আমার – তারপর একটা পার্মানেন্ট চাকরি – আজ এক্ষুণি বাড়ি ফিরতেই হবে – দো পল জীবন সে এক উমর চুরানি হ্যায় ... ডাউন ট্রেন আসে যায় ঝমাঝম ঝমাঝম ঝমাঝম – অন্য কোথাও – অন্য কোথাও – অন্য কোথাও – সে যে ঐ ক্ষণিকধারায় উড়ে যায় বায়ুবেগে – রেললাইনে জ্যোৎস্নার ফালি চকচক ক'রে, চকচক ক'রে, চকচক ক'রে – ও মা, মা গো – কোথায় যাব আমি ?

জ্যোৎস্না ওকে ঘিরে ধরেছিল। খাবিখাওয়া মাছের মত ছটফট করছিল রিংকু; বেরোনোর চেষ্টা করছিল প্রাণপণ –

দুহাত দিয়ে ছেঁড়ার চেষ্টা করছিল চাঁদের জাল অথচ আঙুলের ফাঁক দিয়ে পিছলে বেরিয়ে যাচ্ছিল সূক্ষ্ম সব রূপোলী সুতো এবং জটিল নকশা। টিংকু প্রথমটায় গুটিশুটি বসে ছিল এককোণে, কিন্তু প্যার কা নগমা রিংকুকে আপাদমস্তক কব্জা করে ফেলছে দেখে টিংকু ওকে আড়াল করে দাঁড়াল, তারপর রুটি দিয়ে বাঁধাকপি গেলার মত খাবলা খাবলা জ্যোৎস্না ঠুসতে লাগল নিজের মুখে। এঁকেবেঁকে পালাতে চাইছিল বাকি আলোটুকু – টিংকু এবার সটান কামড় দিল চাঁদে – টপটপ ক'রে ঝরে পড়ল রস – রেললাইন আর প্ল্যাটফর্মে। খানিকটা চাঁদ পিছলে গিয়েছিল – টিংকু তাকে টেনে আনল। চাঁদের আঠায় জড়িয়ে যাচ্ছিল ওর চোয়াল, জিভ – জ্যোৎস্না তার সুযোগ নিচ্ছিল। ফলে, কখনো চাঁদ জিতে যাচ্ছিল, কখনও টিংকু। টানাটানির এই লম্বা খেল খতম হ'ল শেষমেষ – পড়ে রইল কিছু হাড়গোড় আর মাত্র এক ছটাক প্রাগৈতিহাসিক জ্যোৎস্না। গোটা চাঁদ গিলে ফেলেও টিংকু থামছিল না; ওর শরীর বাড়ছিল – প্রথমে ছোটো বেঞ্চ, চায়ের স্টল, আলোর ডুম, একসময় প্ল্যাটফর্ম ঢেকে নিল – তারপর গোটা আকাশ। চাঁদের আলো পুরোপুরি নিভে বৃষ্টি নামল। জোরে। খুব জোরে।

ইন্দ্রাণী দত্ত – সিডনির বাসিন্দা পেশায় বিজ্ঞানী কিন্তু গল্প লেখার তীব্র আকুতি টের পান। শঙ্খ ঘোষ বলেছিলেন, ''আমরা যখন সত্যিকারের সংযোগ চাই, আমরা যখন কথা বলি, আমরা ঠিক এমনই কিছু শব্দ খুঁজে নিতে চাই, এমনই কিছু কথা, যা অন্ধের স্পর্শের মতো একেবারে বুকের ভিতরে গিয়ে পৌঁছয়। পারি না হয়তো, কিন্তু খুঁজতে তবু হয়, সবসময়েই খুঁজে যেতে হয় শব্দের সেই অভ্যন্তরীণ স্পর্শ।'' ইন্দ্রাণী খুঁজে চলেছেন।

''সমতল পথের উপরে
মেঘের ভিতর দিয়ে এই শান্ত সুগোপন পথচলা
ভাবে যে তোমারও মন
সেও হয়তো আছে কোনোখানে এ সংসারে কোনো এক স্তব্ধ গলিকোণে''

মন – শঙ্খ ঘোষ

দেবশ্রী মিত্র

সেফ্ রাইড

সাহিলদের অতি রক্ষণশীল পরিবার। বাপ দাদার গাড়ির ব্যবসা। পরদাদা শুরু করেছিল গাড়ি সারানোর দোকান দিয়ে, এখন দিল্লিতে তিন তিনটে শোরুম। বাবুজি, দুই চাচা আর দাদা মিলে দেখে। ওদের বাড়িতে বউরা এখনো শ্বশুর ভাসুরদের সামনে ঘুংঘট করে, মেয়েদের মুখ বুজে থাকাই সহবত এখানে। মেয়েছেলের আওয়াজ বাইরে গেলো তো বুঝতে হবে সে মেয়েকে সিধে করার দরকার আছে। আর সেটা মুখ ছাড়িয়ে হাত অবধিও পৌঁছয় অবধারিতভাবে। সাহিলও এই বাড়িরই ছেলে, ছোট থেকে এসব দেখেই মানুষ। তাছাড়া এ তো আর আলাদা কিছু নয়, মহল্লার সব বাড়িতেই এই নিয়ম। মেয়েরা বিয়ে হয়ে আসে বিশ বছরে, আসার সময় সঙ্গে করে নিয়ে আসে জবরদস্ত দহেজ আর মা বাপের সিখ, লড়কি কি অরথি সসুরাল সে হি উঠতি হ্যায়। তারপর সসুরালে শাসুমা গোল রুটি বেলতে শেখান দু'চার ঘা দিয়ে, আর স্বামী ভদ্রলোকের তো অগাধ অধিকার। তিনি দিনে রাতে, খানা মনপসন্দ না হলে, বিছানায় বউ ট্যাঁ-ফো করলে, মাইকা থেকে বছরে চারবার মনপসন্দ গিফট না এলে বউকে শিক্ষা দেন। বাড়ির সব ছেলেপুলেই এসব দেখে বড় হয়, তারা জানে এইই হয়, এইই স্বাভাবিক। মেয়েছেলে হবে নরমসরম, মার খেতে জানবে, বাড়ির লোকের সেবা করবে আর তারপর মরে যাবে একদিন।

সাহিল কিন্তু হল অন্যরকম। পাঁচ বছর বয়সে একবার মাকে বাপের বেল্টের মারের থেকে বাঁচাতে গিয়ে তার ডান দিকে চোখের নিচে বেল্টের বাকল লেগে কেটে যায়, প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়। চোখটা বেঁচে যায় যদিও। আর বাপের কপালে জোটে দাদীর গঞ্জনা, বাড়ির বড় ছেলের খুঁতো হলে সে বাড়ির কি আর বদনাম হতে কিছু বাকি থাকবে ? সেই থেকে তার ভাগে মারধোর কিছু কম জুটতো। তার যখন বছর এগার বয়স, মা তাঁর এক বুয়ার সাথে দেখা করতে গেছিলেন বাড়িতে না বলে। বুয়া এসেছিলেন কয়েক দিনের জন্য তাঁর আত্মীয়বাড়ি, আবার কবে দেখা হয় না হয় ভেবে দুপুরবেলা যখন শাশুড়ি ঘুমোচ্ছেন, গেছিলেন দেখা করতে। নসিব খারাপ তাঁর, আসার আগে শাশুড়ির ঘুম ভেঙে যায়। সেদিন কপালে উদোম মার জোটে মায়ের। বউকে মেরে ক্লান্ত হয়ে বাপে ঘুমোচ্ছিল বেলা অবধি, সাহিল চাকু গনগনে গরম করে এনে বাপের হাতে রাম ছ্যাঁকা দেয় একখান, তারপর সেই চাকু ফেলে রেখে এক সপ্তাহের জন্য গায়েব হয়ে যায়। দুষ্টু লোকে বলে লুকিয়েছিল বুয়ার বাড়ি, রোহতকে। মোটকথা, এক হপ্তা বাদে বুয়া এসে মিটমাট করে দিয়ে যায়, সেই থেকে সাহিল এবং তার মা, দুজনেরই মার খাওয়া বন্ধ হয়।

সাহিল যত বড় হয়, ততই বোঝা যায় বাড়ির মত নয় সে। চাচীদের বা মায়ের মার খাওয়া শুধু বন্ধ করায় সে তাইই নয়, বোনেদের স্কুলের পরে কলেজে যাওয়ার ব্যবস্থাও করে দেয়। দাদাজি প্রচুর চেঁচামেচি করেও আটকাতে পারেন নি। চাচাতো বোনের বিয়ে ঠিক হয়েছিল ছোট থেকে দাদাজির দোস্তের পোতার সাথে, সে একটা অমানুষ বললেই হয়। সবরকম বদভ্যাস আছে তাইই শুধু না, খান দুয়েক খুনের ঘটনাতেও নাম জড়িয়েছিল তার। নেহাত বাপের অগাধ পয়সা তাই কিছু হয় নি। সাহিল কিছুতেই সে বিয়ে হতে দেয় নি। ওদের সমাজে কথা দেওয়া বিয়ে ভাঙা অমার্জনীয় অপরাধ, সে মেয়ের বিয়ে হওয়া ভারি শক্ত। তবু সে হতে দেয় নি সে বিয়ে, বলেছে, পড়ুক ছুটকি, বিয়ে কেমন করে না হয় দেখার জন্য ওর ভাইয়া আছে তো! উঠাকে লায়েঙ্গে দুলহা। কখনো খাওয়ার টেবিলে কথা উঠলে বাপ কটমট করে তাকায় মায়ের দিকে, দাঁত পিষে বলে, কী এক ছেলের জন্ম দিয়েছিল! পরিবারের নাম ডোবাবে। মন করে এমন ছেলের জন্ম দেওয়ার অপরাধে দেয় দু'ঘা কষিয়ে, কিন্তু সাহস নেই।

সাহস নেই কারণ সাহিল এখন হাট্টাখাট্টা সা-জওয়ান ছেলে। তার বাপের মত চারটে লোককে মেরে শুইয়ে দিতে পারে

সে এক হাতে। দেয়ও। কোথাও ইভ টিজিং দেখলে, মেট্রোয় মেয়েদের পিছনে দাঁড়িয়ে ধাক্কা মারা ছেলে দেখলে সাহিল সেখানে একটা বাওয়াল না করে আসবে না। ব্যবসায় মন নেই, দোকানে মোটেই যেতে চায় না, এই এক সমস্যা। বাপের ইচ্ছে ছিল ছেলের জন্য আলাদা করে আরেকটা দোকান করে দেয়, তা সে নিজেদের দোকানেই এলে তবে তো ! গাড়ি কেনালো তিনটে, তারপর ভাড়ায় লাগালো। ড্রাইভার নিল জিমের চেনাশোনা বন্ধুদের। মহিলা হলে বিশেষ সাবধানে নিয়ে যায় যেন, বলা থাকত। তাছাড়া, রাতের বেলায় মেয়েদের জন্য বিশেষ ছাড় থাকত, যারা কাজ থেকে ফিরছেন বা যাচ্ছেন তাঁদের জন্য। এইসব করে চলছিল আরকি, যদি অবশ্য তাকে চলা বলে। বাপ দাদার চিন্তা ছেলে বাড়ির নাম ডোবাবে, মায়ের চিন্তা ছেলের এইসব করতে গিয়ে কোনদিন কিছু হয়ে না যায়। আর দাদীর চিন্তা এরকম নামর্দ ছেলে, যে মেয়েমানুষকে হাতের জোরে সোজা রাখতে পারে না, তাকে মেয়ে দেবে কে ? এইভাবে চলতে চলতেই একদিন বিকেলে তার ড্রাইভার বন্ধুর ফোন এল, সাহিল আজ নহি হোগা ইয়ার। কাম আ গয়া কোই।

কোই না, আজ রাত ম্যায় হি ম্যানেজ কর লেতা হুঁ। হয় এরকম, কোই না। সাহিল নিজেই গাড়ি নিয়ে বেরোয় সাতটা নাগাদ। অফিসপাড়ার দিকে গাড়ি দাঁড় করালে চেনামুখ মেলে দু'চারটে। কেউ ভাইয়া ডাকে, কেউ ভাইয়াজি। সাহিল গাড়ি লাগায় বাস স্টপের উল্টোদিকে। কাঁচ নামিয়ে বসে থাকে। খানিক বাদে এক অচেনা মহিলা এসে দাঁড়ান বাস স্টপেজে, সাথে একজন পুরুষ। দুজনের তর্ক হচ্ছে কিছু নিয়ে, দৃশ্যতই মেয়েটি অতি বিরক্ত। ছেলেটি কিছু বোঝানোর চেষ্টা করছে, মেয়েটি কোন কথাই শুনতে রাজি নয়। ছেলেটি হাত ধরতে যায়, ঝটকা মেরে সরিয়ে দেয় মেয়ে। সাহিল নেমে আসে গাড়ি থেকে, কাছে গিয়ে বলে, কী হয়েছে ? কী সমস্যা ? ছেলেটি কিছু বলার আগেই মেয়েটি বলে ওঠে, কিছু না। আপনাকে ডেকেছি আমি ? নিজের কাজ করুন না।

খানিক বিরক্ত হলেও সাহিল শান্ত স্বরে বলে, আপকো তং কর রাহা হ্যায় ইয়ে ? ক্যায়া হুয়া ? ততোধিক বিরক্ত স্বরে মেয়েটি বলে, আপ কৌন লাগতে হ্যায় মেরা ? ভাই ? চাচা ? নানা ? আপনা কাম করো, মুঝে খুদ কা প্রবলেম নিপটানা আতা হ্যায়। রাগে অপমানে সাহিলের কানমুখ লাল হয়ে ওঠে, তবুও সে ফিরে গিয়ে গাড়িতে বসে থাকে, অভ্যাসবশত চলে যেতে পারে না। কাঁচ নামিয়ে বসে থাকে, চোখ বাস স্ট্যান্ডের দিকে। খুবই উত্তপ্ত তর্ক হচ্ছে বোঝা যায়, মেয়েটি দুতিনবার ছেলেটির ধরতে আসা হাত সরিয়ে দেয় বিরক্তিতে। তা সত্ত্বেও হাত বাড়ায় ছেলেটি, এবং মেয়েটি সপাটে চড় কষায় তার গালে। প্রাথমিক অবিশ্বাস কাটিয়ে ছেলেটি আবার হাত ধরতে যায় তার, এবং এবার প্রেমিকের ভঙ্গীতে নয়। মেয়েটি হাত মুচড়ে ধরে তার, এবং বেশ জোর গলায় বলে, কারণ রাস্তার এপাড় থেকে সাহিল পরিষ্কার শুনতে পায়, আগলে বার পাস আনে কি কৌশিশ করেগা তো জান লে লুংগি। ভাগ আভি, কুত্তে কা আউলাদ।

সাহিল গাড়ি ঘোরায়, চোখের নিচের কাটাটায় হাত বুলোয়, বিড়বিড় করে বলে, রাণ্ডী শালী, আদমি পে হাত উঠাতা হ্যায়! মরনে দো!

গাড়ি ঘুরিয়ে অন্যদিকে চলে যায় সাহিল, অন্য কোথায় কোন মেয়ের রাইড দরকার খুঁজতে। দিল্লি খুবই অসুরক্ষিত শহর, অনেক মেয়ের সেফ রাইড দরকার পড়ে।

সুজয় দত্ত

লেবু

'লেবু তো কত রকমের হয় — পাতিলেবু কাগজিলেবু গন্ধরাজলেবু মুসাম্বিলেবু কমলালেবু বাতাবিলেবু' ।

তীক্ষ্ণ গলাটা চলন্ত বাসের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত ছড়িয়ে যাচ্ছিল, মহানগরীর বুকে ব্যস্ত দুপুরের যানবাহনের কর্কশ শব্দ ছাপিয়ে ।

'কিন্তু রস নিংড়ে বার করার এমন যন্ত্র আর দুটি পাবেন না । বৌদিরা, বোনেরা, মাসিমারা, কাকিমারা — পাতিলেবুর শিরা কাটতে গিয়ে বঁটিতে বা ছুরিতে হাত কাটে না আপনাদের ? বলুন না, কাটে না ? হাতে কচলে মুসাম্বির রস করতে গিয়ে তাতে ছিবড়ে মিশে যায় না ?'

আধা-ভীড় বাসটার ভেতরে বসে-দাঁড়িয়ে থাকা যাত্রীদের খোশগল্প, মোবাইলে অনর্গল কচকচালি, কন্ডাক্টারের হাঁকডাক — কোনোকিছুই গ্রাহ্য না করে বলে চলে সেই কণ্ঠস্বর । কৌতূহলী কিছু চোখ আকৃষ্ট হয় সেদিকে ।

'তাই তো আমাদের কোম্পানী আপনাদের সুবিধের জন্য বার করেছে এই স্পেশাল প্যাক — রস করার যন্ত্র ছাড়াও পাচ্ছেন খোসা ছাড়াবার পীলার আর এই সুন্দর প্লাস্টিকের বাটিটা । একটা পাঁচটাকা, দশটাকায় দুটো, তিনটে নিলে বারোটাকায় পাচ্ছেন দিদিমণিরা — ।'

এতেও কেউ আগ্রহ না দেখানোয় এবার শুরু হয় লাইভ ডেমনস্ট্রেশন । কাঁধের ঝোলা থেকে বেরিয়ে আসে একটা পাতিলেবু, পকেট নাইফে চারটুকরো হয়ে চালান হয়ে যায় রস করার যন্ত্রের মধ্যে । ফোঁটা ফোঁটা রস জমা হয় স্বচ্ছ প্লাস্টিকের বাটিটায় ।

এই অবধি সব ঠিকই ছিল, কিন্তু হঠাৎ দরজার কাছে সামনের সীটে বসে থাকা নাদুসনুদুস ভদ্রলোক কন্ডাক্টারের 'মিন্টো পার্ক মিন্টো পার্ক' চীৎকার শুনতে না পেয়ে স্টপটা মিস করে যেতেই 'এই রোখ্‌কে রোখ্‌কে' বলে উঠে দাঁড়িয়ে সজোরে ঘন্টি টেনে ধরলেন । আর বাসটা হ্যাঁচকা মেরে থেমে যাওয়ায় টাল সামলাতে না পেরে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন একেবারে রসওয়ালার ঘাড়ে । তার হাতের রস ছিটকে গিয়ে পড়ল লেডিজ্ সীটে বসা নীল সালোয়ার-কামিজের গায়ে, কাঁধের ব্যাগ মেঝেতে গড়াগড়ি খেল, কয়েকটা লেবু পিংপং বলের মতো লাফাতে লাফাতে অদৃশ্য হল দরজার বাইরে । এক-বাস লোক সাক্ষী যে দোষটা আদৌ তার নয় । কিন্তু কন্ডাক্টার যখন তাকে চোটপাট করে নামিয়ে দিল, কেউ টুঁ শব্দটিও করল না ।

'পল্টু ! এই পল্টু !' চেনা গলার ডাকে সম্বিৎ ফেরে তার । দুশো পঁইতিরিশ রুটের বাসটা থেকে নেমেছে লিটন । সেও ফেরিওয়ালা, তার ঝোলায় ঝাল লজেন্স, মুখশুদ্ধি, প্যাকেটে করা চানাচুর । 'কিরে, মাল রাস্তায় গড়ায় কেন ? কোনো হুজ্জুতি হয়েছে নাকি ?' চোখে প্রশ্ন নিয়ে ভুরু কুঁচকে এগিয়ে আসে সে । লেবু কুড়োতে কুড়োতে ঘটনার বিবরণ দেয় পল্টু, দিতে দিতে হেসে ফেলে —

'তাও তো শুধু রস পড়েছে । আর এট্টু হলে নিজেই গিয়ে পড়তাম বৌদির কোলে । লাক্ খারাপ মাইরি, হলনা ।'

— 'ব্যাটা, খালি বৌদি তোলার ধান্ধা ! পকেটে মালকড়ি আছে কিছু ? একটা চা হবে ?'

— 'কেন, তোর নেই বুঝি ? নাকি দুপুরে আবার গান্ডেপিন্ডে সাঁটিয়েছিস ? লজ্জা করেনা ? বাড়ীতে বৌ-বাচ্চা না খেয়ে রয়েছে —'

— 'না না, মাথা খারাপ ! আজ বিজনেস হয়নি ভাল । দেখনা, তিনশো টাকার মাল নিয়ে বেরিয়েছিলাম, পঁচিশ টাকাও ওঠেনি । সারাদিন টো-টো করে ঘুরছি রোদে, গলা শুকিয়ে কাঠ । তুই ব্যাটা দিন দিন কেমন হয়ে যাচ্ছিস ! এক কাপ চা খাওয়াতে এত কথা ?'

পকেট থেকে কিছু খুচরো বার করে দিয়ে আর দাঁড়ায় না পল্টু । হাঁটা লাগায় । লিটনকে হাড়ে হাড়ে চেনে ও, চা খেয়েই বলবে একটা কেক খাওয়া না রে, কিংবা দুটো মিষ্টি । তিন বছর এই লাইনে কাজ করছে দুজনে, চিরকাল পল্টুই খাইয়ে গেল । অবশ্য ওর বৌ-মেয়ের কথা মনে পড়লে এসব ভাবনা স্বার্থপর শোনায় । বেশ কয়েকবার ওর বস্তির খুপরি ঘরে গেছে পল্টু । দেখেছে কিভাবে থাকে ওরা । হাঁড়ি তো চড়েই না, পরণে লজ্জানিবারণের পোশাকটুকুও এত শতচ্ছিন্ন যে দু-একবার লিটনের অগোচরে ওর বৌয়ের হাতে টাকা গুঁজে দেওয়ারও ইচ্ছে হয়েছে । কিন্তু চুমকি, মানে লিটনের বৌ, নেয়নি — নেওয়ার সাহস নেই । বর কোনোভাবে আঁচ করতে পারলে ওর কী অবস্থা করতে পারে, তার কিছু চিহ্ন ওর গায়েই রয়েছে । ব্যাটা দুমুখো সাপ — নিজে রাস্তায় ঘাটে লোকের কাছে হাত পেতে খাবে, ওদিকে বৌ টাকা ধার করতে গেলে বৌয়ের ওপর চোটপাট । এত ভাল বৌটা — কতবার বোঝাতে চেয়েছে ও দু-চার বাড়ী ঠিকে ঝিয়ের কাজ নিলে সংসারটা একটু দাঁড়ায়, কিন্তু সে হবার জো আছে ? বাবুর নাকি সম্মানে বাধে বৌয়ের গতর ভাঙিয়ে খেতে । হুঁঃ, সম্মান না ইয়ে !

অভাব পল্টুদের সংসারেও কম নয় । ছোটবেলা থেকে দেখেছে বাবাকে মুখে রক্ত তুলে খাটতে । তাও চারজনের পরিবারে সচ্ছলতা কোনোদিনই ছিলনা । দিন চলে যেত, ব্যস এইটুকুই । ও আর ওর বোন স্কুলেও ভর্তি হয়েছিল । কিন্তু ভাগ্যের আসল খেলা শুরু হল পুঁচকে ভাইটা হওয়ার পর । বাবা গার্ডেনরিচ শিপ্‌ইয়ার্ডে নাইট শিফ্‌টে কাজ করত, এক ভোরে আর বাড়ী ফিরল না । সেদিনের কথা মনে পড়লে আজও নিজের অজান্তে কেঁপে ওঠে ও । সকাল থেকে খোঁজ-খোঁজ । পাশের বাড়ীর রতনজ্যেঠু খবর দিতে পারল না, বলল সন্ধ্যের পর আর দেখা হয়নি ইয়ার্ডে । মা পাগলের মতো একবার বিনুদের বাড়ী, একবার অশোকদের বাড়ী ছোটাছুটি করছে । পাড়ার রকবাজ মস্তানদের লিডার চম্পি — যে বাবাকে কাকাবাবু বলে ডাকত আর বাড়ীতে মাঝেমাঝে আসাযাওয়া করত — জানাল ঐ এলাকাটা রাইভাল মস্তান কানা সুবলের আর তার সঙ্গে কিছুদিন ধরেই নাকি বাবার খিটিমিটি চলছিল । চা-সিগারেট ছাড়া জীবনে যার কোনো নেশা নেই, শুধু নিজের কাজ আর পরিবার নিয়েই জগৎ, তার সঙ্গে একজন দাগী মস্তানের কেন খিটিমিটি থাকবে — মাথায় ঢোকেনি পল্টুর । চম্পি অবশ্য ভরসা দিয়েছিল, কানা সুবল যতই খতরনাক হোক, তার যদি এই ঘটনায় কোনো হাত থাকেও সে খুনটুনের মতো বাড়াবাড়ি করবে বলে মনে হয়না । সুতরাং দুশ্চিন্তার কিছু নেই । এসব কথা অবশ্য মাকে আর বলেনি পল্টু । বলার সুযোগই বা পেল কোথায় সেই ঘটনাবহুল দিনের রুদ্ধশ্বাস চিত্রনাট্যের মধ্যে ? বিকেলে পুলিশ এসে তুলে নিয়ে গেল তাকে আর তার মাকে । প্রথমে থানা, তারপর মর্গ । কিন্তু মর্গে গেলেই কি আর দেহ মেলে ? স্বাভাবিক মৃত্যু তো নয়, শিপ্‌ইয়ার্ডে খুন বলে কথা । কাটাছেঁড়া হবে, আরো কত নাটক হবে । তার আগে শ্মশানের প্রশ্নই নেই ।

ঠিক কেন যে খুন হয়েছিল বাবা, তা আজও জানেনা পল্টুরা । পুলিশ এর কিনারা করার চেষ্টা করবেনা বা করলেও পারবেনা, সে তো জানা কথাই । এরকম ঘটনা হামেশাই ঘটে । আর বাবার গায়ে তো কোনো রাজনৈতিক রং ছিলনা যে মৃতব্যক্তিকে তাদের বলে দাবী করার জন্য পলিটিকাল পার্টিগুলোর মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যাবে । তাই ব্যাপারটা প্রত্যাশিতভাবেই থিতিয়ে গিয়েছিল । এককালীন কিছু টাকাপয়সা পাওয়া গেলেও মৃতের পরিবারকে চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি কেউ দেয়নি । তাছাড়া পল্টু তো তখনও নাবালক । কিন্তু পেটের খিদে তো নাবালক-সাবালক মানেনা । মা এমনিতে কর্মক্ষম হলেও ঐ ঘটনার পর দ্রুত ভাঙতে লাগল শরীর । আর সংসারের চারটে প্রাণীর ভরণপোষণের ভার খুব তাড়াতাড়িই চলে এল পল্টুর কাঁধে । সেই চোদ্দ বছর বয়েস থেকেই রূঢ় বাস্তবের মুখোমুখি । স্কুল ছাড়ল ভাই-বোন । প্রথমে বাজারে মুকুন্দর চপ-কাটলেটের দোকানে হেল্পিং হ্যান্ড, তারপর ঐ বাজারেরই একমাত্র হার্ডওয়্যার স্টোরে সিমেন্ট-বালি-লোহালক্কড়ের কাজ, আর বছর তিনেক আগে সেই দোকান লাটে ওঠার পর এই কৃষ্ণা প্রোডাক্টসের সেল্‌স্‌ম্যান্‌শিপ । সেটা যোগাড় করতেও কম কাঠখড় পোড়াতে হয়নি — নেহাৎ অশোকের মামা ঔকানকার সেল্‌স্ ম্যানেজার তাই ।

এসব কথা ভাবতে ভাবতে কখন যে বাড়ীর কাছাকাছি এসে গেছে খেয়ালই করেনি। পুরনো জীবনের কথা মনে পড়লে নিজেকে কেমন যেন বয়স্ক বয়স্ক লাগে ওর। অথচ সবে বাইশে পা দিয়েছে। বোনটারও তো এই সেদিন আঠেরো হল। ওকেও কেমন বয়সের তুলনায় পোড়-খাওয়া মনে হয়। আজকাল আবার পাড়ার একটা ফচকে ছোঁড়ার সঙ্গে মাঝেমাঝেই ওকে ঘুরতে দেখা যায়। ছেলেটার নাম মিঠুন, রমেনবাবুর বাড়ীর দোতলার ভাড়াটে ওরা। পাড়ার পুজোআচ্চায় ফাংশানে-টাংশানে ছেলেটার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হয়েছে। খুব একটা ভাল লাগেনি পল্টুর। চোয়াড়-মার্কা চেহারা, কথাবার্তায় ওপরচালাক। চাকরিবাকরিও তো করে বলে মনে হয়না। নাহলে রোজ সকাল-বিকেল পাড়ার মোড়ে গুলতানি আর আড্ডার সময় পেত ? এই তো, আজও রয়েছে। আজ যেন একটু বেশী উত্তেজিত। হাত-পা নেড়ে খুব কপচাচ্ছে। ব্যাপার কী ?

বাড়ীতে ঢুকতেই অবশ্য ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। বিল্টু, মানে ওর ছোটভাই, ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিল আজ দুপুরে নাকি পুলিশ বাবুয়া মস্তান আর তার সাঙ্গোপাঙ্গদের পাড়া থেকে তুলে নিয়ে গেছে। হঠাৎ ডেরায় হানা দিয়ে বন্দুক-টন্দুক গুলিবারুদও নাকি পেয়েছে অনেক। একটু অবাক হয় পল্টু — ভরদুপুরে পুলিশ বাবুয়ার এলাকায় ধরপাকড়ের সাহস পেল ? বাবুয়া ছিঁচকে মস্তান নয়, রীতিমতো দোর্দন্ডপ্রতাপ। এ হল সেই চম্পির ভাই। চম্পি নিজে বহুদিন হল চোরাচালানের মামলায় ফেঁসে গিয়ে জেলে। তার যোগ্য উত্তরাধিকারী বাবুয়া শুধু সাম্রাজ্যই অটুট রাখেনি, এক কাঠি ওপর দিয়ে গেছে। এই পুরো এলাকার একনম্বর তোলাবাজ সে, তার মাথার ওপর রাজনৈতিক 'দাদাদের' নিরাপত্তার ছাতা — তাই পুলিশ তাকে ছুঁতে পারেনি কোনোদিন। তবে দোষ যতই থাক, পাড়ার খুচরো ঝুটঝামেলায় বা পল্টুদের বিপদে আপদে সে ছিল বড় ভরসা। যা কিছু হোক একবার বাবুয়াদার কানে তুলে দিলেই হল — নিমেষে সমাধান। সেই ভরসাটা আর রইল না তাহলে। আসলে এ বছরের গোড়ায় এই এলাকার রাজনৈতিক রংবদল হয়েছে, এম পি আর এম এল এ — দুটোই এখন অন্য দলের। তারপর থেকেই পুলিশের তৎপরতা বেড়েছে।

যাকগে যাক, শুধু বিল্টুটার কথা ভেবেই চিন্তা হয়। সারাদিন পাড়ায় টো-টো করে ঘোরে ওর বয়সী ছেলেদের সঙ্গে। পড়াশোনার বালাই নেই। যখনই ডাকতে যাও হয় মাঠে বল পেটাচ্ছে নয় সিনেমা হলে লাইন দিয়ে আছে। অসৎসঙ্গ মানুষের কী সর্বনাশ করতে পারে তার উদাহরণ পল্টু এই বাইশ বছরের জীবনে তো কম দেখেনি। আজ বাবা বেঁচে থাকলে বা মা সেই আগের মা থাকলে ও এভাবে ছাড়া গরু হবার সুযোগ পেত ? ভাইকে শাসন করার অক্ষমতা রাগ হয়ে ঝরে পড়ে পল্টুর গলায়, কড়াভাবে জিজ্ঞেস করে, ''তুই এত খবর জানলি কোথ্ থেকে ?'' উত্তরে আমতা আমতা করছে দেখে আরো রেগে যায়, ''একটা টেনে থাপ্পড় মারব ! বল শিগ্‌গির !'' বিল্টু বেগতিক দেখে সত্যিকথাটা ওগরায়, ''কান্তি-শান্তিদের বাড়ী টিভি দেখতে গিয়েছিলাম, ওরা বলল।''

''কান্তি-শান্তিদের বাড়ী !!'' এবার ফেটে পড়ে পল্টু, ''শয়তান ছেলে ! তোকে একশো একবার বারণ করেছি না ও-বাড়ীর ধার মাড়াতে ? তাও গেলি ? লজ্জাশরম বলে কিছু নেই ? দাঁড়াও, টিভির নোলা বার করছি আমি তোমার ! আর যদি কোনোদিন শুনি ওমুখো হয়েছ তোমার ঠ্যাং ভেঙে রেখে দেব বলে দিলাম।'' দু-চার ঘা কষিয়েও দিত হয়তো ভাইকে, কিন্তু ঠিক এইসময় বান্টি ''কী হয়েছে রে দাদা, চেঁচাচ্ছিস কেন ?''বলে ঘরে ঢোকায় বেঁচে গেল সে। ছুটে পালিয়ে গেল দরজা দিয়ে। এখন এই ভর সন্ধ্যেবেলা আবার কার বাড়ী গিয়ে বসে থাকবে কে জানে।

কান্তি-শান্তিদের বাড়ীর কথা শুনে পল্টুর তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠার পেছনে একটা ইতিহাস আছে। বাড়ীটা দুটো গলি পরেই, পল্টুদের ঘরের জানলা থেকে তার দোতলার ছাদ আর বারান্দাটা দেখাও যায়। কান্তিরা বছরখানেক হল এসেছে এ-পাড়ায়, রঙের ব্যবসা ওদের, অবস্থা-টবস্থা বেশ ভালই। বাবার স্ট্রোক হয়ে যাবার পর থেকে বড়ছেলে শান্তিই সব দেখাশোনা করে। যাই হোক, সেই জানলা দিয়ে এক কাজকর্মহীন বর্ষার সকালে তাকিয়ে থাকতে থাকতে পল্টু দেখে ফেলেছিল তার জীবনের প্রথম, এবং একমাত্র, প্রজাপতিটিকে। শান্তির বোন শিপ্রা। ছিপ্‌ছিপে গড়ন, সবে কলেজের সেকেন্ড ইয়ারে উঠেছে। এমনিতে ওর দিন-আনা দিন-খাওয়া শুঁয়োপোকার জীবনে, যেখানে চারটে প্রাণীর অন্নসংস্থানই একমাত্র

চিন্তা, ওসব প্রজাপতি-টজাপতি যে বিলাসিতা তা ভালই জানে পল্টু। কিন্তু সেদিনের সেই বর্ষাভেজা এলোচুলের চেহারায় কী একটা ছিল, তারপর থেকে চেতনে-অবচেতনে খালি ওদিকেই চোখ চলে যায়। দৃষ্টিপথের ওইপ্রান্তে যে আছে সে ওকে খেয়াল করেছে কিনা, তা তো জানার উপায় নেই। সরস্বতী পুজোর চাঁদা চাইবার ছুতোয় ঐ বাড়ী গিয়ে প্রথম মুখোমুখি দেখা — তাও কয়েক সেকেন্ডের। পরের কয়েকমাস প্রতিদিন সকালে ও কৃষ্ণা প্রোডাক্টসের ঝোলা নিয়ে ঠিক সেই সময়ে বাসস্টপে দাঁড়িয়ে থাকত যখন শিপ্রা কলেজের বাসে ওঠে। দুচোখ ভরে দেখত, যদিও এগিয়ে গিয়ে কথা বলার সাহস ছিলনা। কথা বলতে গেলে তো নিজের পরিচয় দিতে হবে — দেওয়ার মতো পরিচয় কি ওর আছে ? ব্যাটা বিল্টুটার কী মজা ! ইতিমধ্যেই মেয়েটার ছোটভাইয়ের সঙ্গে দোস্তি পাতিয়ে রোজ ওদের বাড়ীতে টিভি দেখতে যাচ্ছে আর ওর মায়ের হাতের রুটিটা-পরোটাটা খেয়ে আসছে। বাচ্চাদের ব্যাপারই আলাদা। পল্টু বিশ্বাসের এই প্রাত্যহিক একতরফা বাসস্টপ-রোম্যান্সের খবর অবশ্য বেশীদিন চাপা থাকেনি। ওর বোন বান্টি তো শিপ্রার নাম দিয়েছিল 'দাদার ঘড়ি'। বন্ধুবান্ধবরাও আড়ালে টিটকিরি দিত। তা এই বন্ধুদের মাধ্যমেই হোক বা অন্য কোনোভাবে — কথাটা একদিন গিয়ে উঠল শান্তির কানে। এইরকম ক্ষেত্রে লোকে কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানাবে সেটা বোধহয় নির্ভর করে তাদের পারিবারিক কাল্চার আর রুচিবোধের ওপর। শান্তি সরাসরি পল্টুকে শাসালে বা ধমকি দিলে কিছু বলার ছিলনা। কিন্তু সে কী করল ? না, ওর বারো বছরের ভাইটাকে একদিন অশ্রাব্য গালাগালি দিয়ে বাড়ী থেকে বার করে দিল, বলল ওদের মতো ছোটলোকদের কীভাবে পাড়াছাড়া করতে হয় তা তার ভালই জানা আছে।

এই ঘটনার পর প্রায় একবছর কেটে গেছে। বাচ্চাদের ধর্ম অনুযায়ী বিল্টু-কান্তির ছেঁড়া বন্ধুত্ব আবার জোড়া লেগে গেছে একটু একটু করে। কিন্তু পল্টু সেই অপমান কখনো ভুলতে পারে ? ভুলতে চাইলেও লোকে ভুলতে দেবে ? বারবার মনে করিয়ে দেবে। এই যেমন বান্টি। দেখতে পাচ্ছে ঐ অপমানের বাড়ীতে ভাই আবার গেছে শুনে দাদা রেগে আগুন, সেক্ষেত্রে তার ঘরে ঢুকেই ফস্ করে এটা বলার কী দরকার ছিল যে পরশুদিন সে শিপ্রাকে ওর নতুন বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে দেখেছে ? এ কি পুরনো ঘা খুঁচিয়ে তুলে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেবার শয়তানি ? রাগ সামলে পল্টু বলল, ''বড্ড পেকেছিস তুই আজকাল। আজ হঠাৎ শুক্কুরবার সন্ধ্যেবেলা বাড়ীতে কেন ? টিউশানি নেই ?'' মাস ছয়েক হল পাশের পাড়ার দত্তদের বাড়ীতে দুটো প্রাইমারী ইস্কুলের মেয়েকে পড়াতে ঢুকেছে বান্টি। এটা ওর নিজেরই জোগাড় করা — একেবারে বাড়ীতে বসে থাকার চেয়ে যা দুপয়সা আসে তাতেই তো সংসারের লাভ। দাদার প্রশ্নের উত্তরে জানায়, আজ পড়াতে যেতে পারবেনা বলে দিয়েছে, তার বদলে রোববার বিকেলে যাবে।

''বললি কী করে ? নিজে গিয়ে বলে এলি নাকি ? এতো সেই বাবু বলছেন বাবু বাড়ী নেই-এর গল্প'' — হাসবার চেষ্টা করে পল্টু। ''ধ্যাৎ, কী যে বলিস না !'' অসহিষ্ণু উত্তর বান্টির, ''মিঠুনদার মোবাইল থেকে ফোন করে দিয়েছি।''

''কার মোবাইল থেকে !!''

''আরে বাবা মিঠুনদার। তোর জেরা বন্ধ কর তো ! আমার তাড়া আছে। একটু খুচরো হবে ?''

পল্টু কী বলবে ভেবে পায়না, জানতে চায় কিসের তাড়া আর খুচরোই বা কী হবে। উত্তর আসে, সিটি সেন্টার মলের মাল্টিপ্লেক্সে সিনেমা দেখতে যাচ্ছে, খুচরোটা বাসভাড়ার জন্য।

সিটি সেন্টার ! মাল্টিপ্লেক্স !! বান্টি কি উন্মাদ ? ওখানে যেকোনো সিনেমার এক-একটা টিকিট কত সে-সম্বন্ধে কোনো ধারণা আছে ওর ?

''হোক না দাম। একদিনই তো যাচ্ছি।'' নির্বিকার গলায় বলে বোন।

''টাকা পাচ্ছিস কোথায় এত ? টিউশানিতে আগাম-ফাগাম দেয় নাকি ? আর দিলেও, টিউশানির টাকাটা তোর মস্তির জন্য নাকি ?'' এক নিঃশ্বাসে বলে ফেলে পল্টু।

''ওঃ, যতক্ষণ বাড়ী থাকবি খালি খ্যাচ্ খ্যাচ্ খ্যাচ্ খ্যাচ্।'' একরাশ বিরক্তিমাখানো জবাব আসে, ''মিঠুনদা দেখাচ্ছে সিনেমা — হয়েছে ? আর কিছু বলার আছে ?'' তারপর দড়াম করে দরজাটা খুলে যায়, আবার সশব্দে বন্ধ হয়। তার আড়ালে অন্ধকারে মিলিয়ে যায় বান্টি।

বলার যে কত কী আছে, সে কি পল্টু গুনে শেষ করতে পারবে ? কিন্তু শুনছে কে ? দুহাতে মাথা রেখে ভাবতে বসে পল্টু। এখন ঠিক কী করতে পারে ও ? একদিন মিঠুনদের বাড়ীতে গিয়ে আচ্ছা করে কড়কি দিয়ে আসবে ছেলেটাকে ? নাকি শুধু ওর মার সঙ্গে দেখা করে ভদ্রভাবে বুঝিয়ে বলবে ? নাকি সেই শান্তির মতো — সেই শান্তির মতো মিঠুনের ছোট ভাইটাকে বাড়ীতে ডেকে এনে পুরো ঝালটা তার ওপরেই ঝাড়বে ? সবকিছু গুলিয়ে যায় ওর। হঠাৎ চমক ভাঙে এক শীর্ণ, অসুস্থ গলার ডাকে, ''পল্টু, অ পল্টু''। রান্নাঘর থেকে মা ডাকছে, ''খেয়ে যা বাবা। আর কত বসে থাকব ?''

আস্তে আস্তে উঠে রান্নাঘরের মেঝেতে মায়ের পাশে গিয়ে বসে ও। রুটি-তরকারীর থালাটা নিতে গিয়ে একটু হাত ঠেকে যায় মায়ের গায়ে।

''একী ! তোমার তো গা গরম। কখন থেকে হল ? বিল্টু-বান্টিকে বলনি ?''

নির্লিপ্ত গলায় উত্তর আসে, ''ও কিছু না, কদিন একটু ঠান্ডা-ঠান্ডা পড়েছে তো, এখন ওরকম হয়। হ্যাঁ রে, তোর আজ কোমিসান আনতে যাবার দিন ছিল না ?''

পল্টু বুঝতে পারে মা সপ্তাহান্তে পাওনা কমিশনের কথা জিজ্ঞেস করছে। সংশোধন করে দিয়ে বলে, ''আজ না, কাল। কেন, বাজার ফুরিয়েছে নাকি ?'' উত্তরে জানতে পারে বাজার নয়, প্রয়োজনটা অন্য। বাড়ীভাড়া বাকি পড়েছে তিনমাসের। বাড়ীওয়ালা গত দুসপ্তাহ ধরে তাগাদা দিয়ে যাচ্ছিল সমানে, আজ এসে নাকি একপ্রকার হুমকিই দিয়ে গেছে। আসলে গত বেশ কয়েকমাস মা নানারকম অসুখে ভুগছে। এক-আধবার ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে আর টুকটাক ওষুধপত্র কিনতে এত টাকা বেরিয়ে গেছে যে বাড়ীভাড়াটা আর কুলিয়ে উঠতে পারেনি। তারপর আবার বিল্টুটা বিশ্বকর্মা পুজোর দিন কাটা ঘুড়ি তাড়া করতে গিয়ে এত্তখানি পা কেটে বাড়ী এল। মরচে ধরা লোহায় কাটা — সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে হল ডিস্পেন্সারীতে। সেখানেও খরচ। কালকের কমিশনের পুরো টাকাটাও যদি বাড়ীভাড়ায় ঢালে, তিনমাসের ঘাটতি পোষানো যাবেনা। তবু মাকে ফাঁকা অশ্বাস দিয়ে বলল, ''ঠিক আছে, কাল আমি দেখব-খন। এখন যাও শুয়ে পড়। খেয়েছ কিছু ?''

মাকে মাটিতে বিছানা করে শুইয়ে নিজেও এসে শোয় ঘরের এক কোণে - হাতকে বালিশ করে। ঘরের টিমটিমে বাতিটা নিভিয়ে দেয়। সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে বারবার শুধু একটা কথাই মনে হয় ওর। পৃথিবীতে ওরা — ওদের মতো মানুষরা — হল লেবুর দল। পাতি-কাগজি-কমলা-মুসাম্বি। আর এই সমাজ হল বিরাট একটা রস নিংড়ানোর যন্ত্র। প্রতিদিন ফোঁটা ফোঁটা করে নিংড়ে নেয় — পালাবার পথ নেই। শুয়ে থাকতে থাকতে একসময় ওর চোখে নেমে আসে ঘুম। স্বপ্নের মধ্যে ভাসতে থাকে কয়েকটা সংখ্যা — পাঁচটাকায় একটা, দশটাকায় দুটো, তিনটে নিলে বারো টাকা —

হয়তো ওদের মতো মানুষের জীবনের দাম।

শ্রাবনী রায় আকিলা

ডিপ্রেশন

জলের গ্লাস হাতে বেডরুমে এসে অনিরুদ্ধ রোজকার মত একই দৃশ্য দেখলো। কোলে ল্যাপটপ, কানে হেডফোন, আর আশেপাশে একগাদা বাংলা ইংরাজি বই, ডায়েরী, পেন ছড়িয়ে, পিঠে বালিশ দিয়ে আয়েশ করে খাটের ওপর বসে আছে শ্রীময়ী। অনিরুদ্ধ জানে, ল্যাপটপ স্ক্রিনে উঁকি দিলেই এখন দেখা যাবে গোটা তিন চার ট্যাব খোলা। নেটফ্লিক্স, নিউ ইয়র্ক টাইমস, ফেসবুক, ইউটিউব ! নয়ত বা কোনো ডাউনলোড করা বাংলা বই। এই রাত সাড়ে নটা দশটা বাজলেই যেন শ্রীময়ীর দিন শুরু হয় ! সব কাজ সেরে, কিচেন মুছে, তার একান্ত 'মি টাইম' এর শুরু। জোর করে না শোওয়ালে রাত দুটো পর্যন্ত্য সে এভাবেই কাটিয়ে দেবে। ওদিকে অনিরুদ্ধর 'মি টাইম' সন্ধ্যেবেলাতেই হয়ে যায়। ভোর বেলা, অফিস যাওয়ার আগে জিম থাকে বলে, সে চায় তাড়াতাড়ি শুতে। যদিও, সে আজও সারারাত না ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিতে পারে যদি শ্রীময়ী ঠিকঠাকভাবে তার শরীর, মন মেলে ধরা দেয়। একা একা শুয়ে পড়ায় অনিরুদ্ধর এত বছর পরেও রুচি নেই। কি জাদুতে, নিজেদের একান্ত মুহূর্ত গুলোতে শ্রীময়ীর মধ্যে অনিরুদ্ধ কখনও অভ্যেসের স্ত্রীকে দেখে না, পুরোনো টানটান আবেদনময় বিবাহ পূর্ব বান্ধবীকেই খুঁজে পায় ! কিন্তু শ্রীময়ীকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে মোটেও তার এতো তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ার কোনো ইচ্ছা নেই। উল্টে ডিনারের পরেও মাঝে মাঝে এমন সময়ে সে এক কাপ কফি নিয়ে এসে বসে। অনিরুদ্ধ শ্রীময়ীর শরীরের কথা ভেবে তাকে বকে, বারণ করে, বেশি রাত না করে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তে বলে, কিন্তু জোর করতে পারে না। সে মনে মনে বোঝে, ডোমেস্টিক হেল্প ছাড়া, এ দেশের জুতো সেলাই থেকে চন্ডীপাঠ জীবনে, সংসার, চাকরী সব সামলে, নিজেদের ব্যক্তিগত ভালোলাগাগুলো নিয়ে একটু আলসেমি করার সুযোগ এই নিরিবিলি রাতটুকুতেই। হাতের জলের গ্লাস মাথার পাশের সাইড টেবিলে রেখে, অনিরুদ্ধ খাটে আধ শোওয়া হয়েই শ্রীময়ীর দিকে ঝুকে, ল্যাপটপ বইয়ের ফাঁক গলিয়ে তাকে এক হাতে জাপটে জড়িয়ে, তার স্লিভলেস রাতপোশাকের বাইরের খোলা হাতে মুখ ঘষে বললো "এই রাখো তো এখন এসব ! শোবে চলো !"

শ্রীময়ী, এই জোর, এই উষ্ণতায় বরাবর দুর্বল হয়ে যায়। কিন্তু এমন সময়গুলোতে ভালো লাগা লুকিয়ে রাখে। নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার কোনো চেষ্টা না করে শ্রীময়ী জিজ্ঞেস করে "তুমি কোনোদিন জেলের ভেতর দেখেছো অনি ? জেলে যারা থাকে, তোমার কোনোদিন জানতে ইচ্ছা হয় তারা কারা ? কি করে তারা ক্রিমিনাল হল ? সব্বাই সত্যিই ক্রিমিনাল কিনা ? ইউটিউবে আছে জানো 'বাহাইন্ড দ্য বার' সিরিজ। কি কষ্ট লাগবে দেখলে !" এবার শ্রীময়ীকে জাপ্টে থাকা অনিরুদ্ধর হাত আপনা থেকেই আলগা হয়ে গেলো ! খানিক বিরক্তি নিয়ে জিজ্ঞেস করল "তোমার মাথায় কি আছে বলত ? এটা একটা সময় হলো এ সব কথা জিজ্ঞেস করার ? হঠাৎ জেল নিয়ে ভাবতে যাব কোন দুঃখে ?" শ্রীময়ী জানে সে নিজেদের ব্যক্তিগত সময়ে এরকম নানান আবোল তাবোল কথা বলে অনিরুদ্ধর মুড নষ্ট করে।

কিন্তু কি করবে ! তার যে অনেক কথা জমে যায়। বলতে ইচ্ছা হয়। সে সব কথাকে কি শুধু নিজেদের সংসারের হতে হবে ? জগৎ সংসারের হতে পারে না ? জগৎ মানে কি শুধু পলিটিক্স, গ্লোবাল ওয়ার্মিং ? পৃথিবীতে রাতের অন্ধকারে পালাতে গিয়ে ভয়াল সমুদ্রে ভেসে যাওয়া কত রিফিউজি, কত কুঠুরিতে কত সেক্স স্লেভ, কত জেলে অপরাধ না করেও পচতে থাকা কত মানুষ, শৈশব হারানো চাইল্ড লেবার এসব নিয়ে কথা বলা যাবে না কখনও ? কারোর সাথে ? বললেই সবার এক কথা "ওতো ভেবো না তো !" নিউজপেপারের প্রতিটা বিষাদমাখা হেডলাইনের সঙ্গে শ্রীময়ী বাস করে। টিভির নিউজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে বেছে বেছে খারাপ খবরগুলো তার দেহে মনে ঢুকে পড়ে। ইউটিউব খুলে সে বিশ্বের জেল দেখে, মানসিক হাসপাতাল দেখে, রিজিউজি জার্নি দেখে । কোনো বই পড়ার পরেও, বেছে বেছে দুঃখের চরিত্ররা তার মাথা মন ঘিরে বসে থাকে কিছুদিন। অকারণে একটা স্বেচ্ছা অবসাদ রচনা না করে সে যেন থাকতে পারে না ! অথচ তার নিজের কোনো

কাজকম্ম পড়ে থাকে না। দায়িত্ব কর্তব্য বোধে শ্রীময়ী সজাগ। অফিসেও সবার সুনজরে। দৃষ্টিকটু গোলযোগ তো তেমন নেই !

শ্রীময়ী ইউটিউবে কি দেখে অনিরুদ্ধ তার অত খোঁজ জানে না। যেটুকু জানে, শোনে তাতে সে শ্রীময়ীকে এক ধরণের পাগল বলে ধরে নিয়েছে। অনিরুদ্ধর মতে, শ্রী পড়াশোনা, কেরিয়ারও বোধহয় ভুল চুজ করেছে। হিউম্যান রাইটস জাতীয় কিছু নিয়ে পড়লে ভালো করত হয়ত ! ফিল্ড এ নেমে কাজ করতে পারত ! একই প্রশ্ন করে যায় অনিরুদ্ধ শ্রীময়ীকে "তোমার ভালো থাকতে ভালো লাগে না শ্রী ? কি খুঁজে বেড়াও সবসময় ?" অনিরুদ্ধ আবার নিজেই নিজেকে বোঝায়, "নাহ সে যা ভাবছে তা নয়, শ্রী ঠিকই আছে, শুধু একটু ভাবে আর দেখে বেশি এই যা !" কোথাও বেড়াতে যেতে পারলে শ্রী সবথেকে বেশি খুশী হয়। অনিরুদ্ধ নিজেও ভালোবাসে বেড়াতে। সে জানে গয়নাগাটি দিয়ে লাভ নেই ! শ্রীকে নিয়ে কয়েকমাস পরপর বরং কোথাও একটু বেরিয়ে পড়াটা জরুরি। তাদের নিজেদের যে সন্তান নেই। তা নিয়ে প্রথম প্রথম শ্রী, অনিরুদ্ধ দুজনারই একটু স্বাভাবিক মন খারাপ হলেও, বাড়াবাড়ি কোনোদিন ছিল না। অনিরুদ্ধ বিয়ের পরে এমনিই বলত, "আচ্ছা শ্রী অ্যাডপ্ট করলে হয় না ? আবার নতুন করে ভীড় বাড়িয়ে কি লাভ !" কিন্তু দেশ আর শহর বদলাতে বদলাতে পাকেচক্রে অ্যাডপ্ট করাটা আর হয়ে উঠলো না। তাছাড়া দুজনাই, নিজেদের এই একা থাকার স্বাধীনতা, হুটহাট বেড়াতে বেরিয়ে পড়াতে, খানিকটা অভ্যস্ত হয়ে গেছে। তবু তাদের এখন সিটিজেনশিপ হয়ে গেছে, নিজেরা এখনো সুস্থ সবল সবে চল্লিশের কোঠায় , তাই অ্যাডপ্ট করার ইচ্ছাটা মাঝে মধ্যে ঘুরেফিরে যে হয় না তা নয়।

একটা জিনিস লক্ষ্য করত শ্রীময়ীর মধ্যে অনিরুদ্ধ। বিয়ের পরে দেশ ছেড়ে প্রথমে সিঙ্গাপুর তারপর বস্টনে আসার পরে, শ্রীর না ছিল আমেরিকা নিয়ে আদিখ্যেতা, না ছিল কোনোদিন নিজের ফেলে আসা দেশ দেশ করে আকুল হওয়া ভাব। পরে আরো দুবার শহর বদলেও তাই। আগের শহরের জন্য, ছেড়ে আসা বন্ধুদের জন্য শ্রীর ভেতরে তেমন হাহাকার নেই কোনোদিন ! কেমন যেন একটা নিজের জগৎ তৈরী করে নেয় তাড়াতাড়ি নতুন শহরে এসে ! ধারেকাছে ঘন সবুজ পার্ক, একটা নিরিবিলি লাইব্রেরী এগুলোর খোঁজ পেলে খুব একটা অভিযোগ করে না কিছু নিয়েই। অনিরুদ্ধের মনে হয়, শ্রী কি কোথাও বিলং করতে পারে না তেমন ? তবু শ্রীর মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে আলাদা করে তেমন কোনো মাথা ব্যথা নেই অনিরুদ্ধর !

কিন্তু শ্রীময়ীর নিজেরই যেন নিজেকে নিয়ে একটু ভাবনা হয়। তার নিজের পরিবার মোটামুটি ঠিকঠাক। কিন্তু ভেতরে ভেতরে মনুষ্য জীবনের কালো দিকগুলো নিয়ে ক্রমাগত সজাগ থাকার জন্য সে যেন কেমন জীবনের আড়ম্বরে, সমারোহে থেকেও নেই। কেনা কাটা, সাজগোজ, বন্ধুসঙ্গ সবেতে তার ভারসাম্যপূর্ণ শখ ছিল, নেশা কোনোদিন ছিল না। ইদানিং যেন তা আরো কমে যাচ্ছে। হঠাৎ করে চটুল ও হালকা লাগতে শুরু করেছে অনেক কিছু ! শ্রীময়ী বুঝতে পারছে সে কেমন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে আশপাশের পরিচিতদের থেকে ! পাখি, প্রকৃতি, তাদের নীরবতা তাকে আরো বেশি করে টানছে। বাড়িতে হঠাৎ এত ফার্নিচার ভালো লাগছে না। গোটাবাড়ির দেওয়ালগুলো নীল সমুদ্র, সবুজ গাছের ম্যুরালে ভরিয়ে দিতে ইচ্ছা করছে। এটা কি ডিপ্রেশন ? পরমুহূর্তেই নিজেকে বোঝায় ... না না মাথা মনের স্টোরেজ লিমিট নেই ! সব ভেবেও তো সে নিজে দিব্যি ফাংশনাল ! জীবন তো আটকে নেই !

আলপটকা জেলের প্রসঙ্গ তুলে ফেলে শ্রীময়ীর নিজেরই খুব খারাপ লাগল। ল্যাপটপ, বই সব ঠেলে সরিয়ে পেছন ফিরে চোখ বুজে শুয়ে থাকা অনিরুদ্ধ কে জড়িয়ে ধরে বলল "রাগ করলে ? না ? এদিকে ঘোরো, ল্যাপটপ রেখে দিয়েছি, আমিও শুয়ে পড়ছি "... অনিরুদ্ধ এসময় রাগ করে থাকার লোক নয়। সঙ্গে সঙ্গে পাশের স্ট্যান্ড টেবিলের আলো অফ করে দিয়ে, সে ফোনের অ্যাপস এ হাত দিতেই ঘর জুড়ে হালকা নীল আলো আর এক মাদকতা ভরা সুর ছড়িয়ে পড়লো। আগে আগে এই সময়গুলোতে সমুদ্র উত্তাল হয়েছে, হাওয়া দামাল হয়েছে, তুমুল বৃষ্টি ভিজিয়ে দিয়েছে চাষের জমি ! কিন্তু ইদানিং সে ঝড়ও যেন স্তিমিত। শ্রীময়ীর থেকে যথারীতি তেমন স্বাভাবিক সাড়া না পেয়ে আজ অনিরুদ্ধ জিজ্ঞেস করে বসল – "কি হয়েছে বলোতো ? কিরকম আড়ষ্ট হয়ে থাকো আজকাল ... আমি কি তোমাকে কষ্ট দিই ?" "ছিঃ ! এরকম কখনো ভাববে না ।"

"তাহলে কি ?"

"আমার সব ... কি সব মনে পড়ে যায় ... ঠিক এই সময়গুলোতে ..."

"মানে ?"

"জানি না ... ওই হায়দ্রাবাদের মেয়েটা ... এতো রেপ, এতো রেপের খবর রোজ রোজ ! কি করে একটা মেয়ে সহ্য করে ! আমি আর নিতে পারছি না ! আমার নিজেরও দেশে গিয়ে ঘুরতে এবার থেকে ভয় করবে !"

"তাই বলে তুমি সেগুলো আমাদের ইন্টিমেসির সময় মনে করবে ? পৃথিবীটা কি আমাদের বেডরুমে ঢুকে পড়ল শ্রী ?"

অনিরুদ্ধ হতভম্ব হয়ে গেলো ! শ্রীময়ীও বোঝাতে পারে না ভাষায়, ঠিক কোথায় এসে কোন মুহূর্তে, কোন কাল্পনিক দৃশ্য সব নষ্ট করে দিচ্ছে। চেনা আদর, কাঙ্খিত স্পর্শ কেন অচেনা অত্যাচার মনে করাচ্ছে ! অনিরুদ্ধর তো কোনো দোষ নেই ! তবু এ কষ্ট অপমানের ভাগীদার সে হয়ে যায় কেন !

"আই ক্যান্ট টেক দিস এনিমোর ফর গ্রান্টেড ! তোমার এবার ট্রিটমেন্ট প্রয়োজন ! এ নিয়ে আর কথা বলতে ভালো লাগছে না। যাও, আমি জল দিচ্ছি। খেয়ে ঘুমিয়ে পড় !"

খাটের পাশের স্ট্যান্ড টেবিলে রাখা জলের গ্লাস শ্রীময়ীর হাতে দিয়ে, অনিরুদ্ধ লিভিং রুমে চলে এলো। বাইরের আবহাওয়া এখন শীত গ্রীষ্মের মাঝখানে ! বরফ নেই, বৃষ্টি নেই, ঝোড়ো হাওয়া নেই। থমথমে ! ঠিক অনিরুদ্ধর মনের মতোই ! অনিরুদ্ধ বুঝতে পারছে না এখন, শ্রীময়ীর এই লক্ষণ কি শুধুই বেশি সংবেদনশীল মনের এক সাময়িক পরিচয় ? নাকি তার মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য যথেষ্ট ভয়ের কারণ ? স্বাভাবিক শ্রীময়ীকে সে কবে ফিরে পাবে ? ভাবতে ভাবতেই অনিরুদ্ধর মনে অন্য প্রশ্ন খোঁচা দেয়। কি স্বাভাবিক ? কারা স্বাভাবিক ? চারিদিকে যত নিষ্ঠুরতা, কষ্ট, অন্ধকার ছড়িয়ে থাকুক, তার মাঝখানে সবসময় জাঁকজমক করে যারা বেঁচে থাকতে পারে শুধু তারাই স্বাভাবিক ? যারা সে বাঁচার নিয়মাবলীর সাথে পুরোটা মানিয়ে নিতে পারে না, পিছিয়ে যায়, একা হয়ে যায়, তারা সবাই অস্বাভাবিক ? কিছু মানুষের এই বেশি ভাবাটাও কি জরুরি নয় ? সত্যি করেই এতো ধর্ষণের খবর, নিজে নিরাপদ পরিবেশে থাকলেও, একটা মেয়ের হাড়ে মজ্জায় তা নিয়ে ভয়, কষ্ট, কল্পনা ঢুকতেই পারে। হয়ত সে নিজে শ্রীর কাছে কিভাবে যেন, তাদের একান্ত ব্যক্তিগত মুহূর্তে এক মাংসাশী পুরুষ জাতির প্রতিনিধি হয়ে ওঠে ! তবু হয়ত শ্রীময়ী ডিপ্রেসনেরই শিকার ! হঠাৎ করেই এক মুহূর্তে অনিরুদ্ধর সব চিন্তা বিরক্তি চলে যায়। মায়া হয় শ্রীময়ীর জন্য ! বেডরুমের বিছানায় সে ফিরে আসে। শ্রীময়ী ঘুমোচ্ছে। অনিরুদ্ধ শ্রীময়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। ভাবে, শ্রীর জন্য ডাক্তারের পরামর্শ নেবে, কিন্তু তার আগে কাল থেকে মাঝে মাঝে সব খবর নিয়ে শ্রীর সাথে খোলামেলা আলোচনা করবে। এড়িয়ে যাবে না। বিরক্ত হবে না। বেশি সংবেদনশীল মানুষরাও কি কি ভাবে, কতটা গভীরে ভাবে ... শুনবে, অনিরুদ্ধ সে সব শুনবে। শ্রীর অবসাদ ছুঁতে হবে তাকে, তার প্রেমিক হয়ে ! আর এ পরিস্থিতির দায়, লজ্জাও নিতে হবে কিছুটা, শুধুমাত্র একজন পুরুষ বলেই !

শ্রাবনী রায় আকিলা – পড়তে, লিখতে, বলতে, শুনতে, জানতে, দেখতে, ভাবতে ভালোবাসেন। এখনও পর্যন্ত্য লিখেছেন আনন্দবাজার, এই সময়, দুকূল, বর্তমান এবং উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন সাহিত্য পত্রিকায়। নিজের একটি ব্লগও আছে। তবে সবথেকে বেশি স্বস্তি বোধ করেন নিজের ফেসবুক ওয়ালে নিয়মিত, স্বাধীন ও ইচ্ছামত লিখতে।

সিদ্ধার্থ দে

বইমেলা ২০২০

বইমেলাতে প্রথম কবে গিয়েছিলাম ঠিক মনে নেই । তবে মনে আছে সেটা হয়েছিল ময়দান অঞ্চলে রবীন্দ্রসদনের কাছে । দুপুর থেকে সন্ধ্যে অবধি ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন স্টলে বই-এর পাতা উল্টেছি মনের সাধে । এভাবে বই ঘাঁটার সুযোগ আগে কখনো পাইনি ।

কিছু টুকরো স্মৃতি থেকে আন্দাজ করতে পারছি সময়টা ছিল ১৯৮২ শুরুতে । সঙ্গে প্রেমিকা রূপে নয়, চন্দনা ছিল সীমান্তে সিঁদুর নিয়ে । মেলায় ঘুরতে ঘুরতে বেশ কয়েকজন অনেকদিন সংযোগ বিচ্ছিন্ন আত্মীয় বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল । অভিযোগ শুনতে হয়েছিল ‘‘বিয়েতে নেমন্তন্ন পেলাম না তো !’’

হিসেব করে দেখছি সময়টা ৩৮ বছর পূর্বের । বই মেলা ব্যাপারটাই তখন হুজুগপ্রিয় বাঙালির কাছে বেশ নতুন । ইতিহাস ঘেঁটে জানলাম সত্তরের দশকের শুরুর দিকে কলেজ স্ট্রীটের কফি হাউসের এক আড্ডায় কয়েকজন প্রকাশক বিশ্ববিখ্যাত ফ্র্যাঙ্কফুর্ট বইমেলার আদলে কলকাতায় অনুরূপ কিছু করার বিষয়ে আলোচনা করেন । সেই চিন্তা বুদ্বুদ প্রাণ পায় ১৯৭৬ সালে । বই দুনিয়ার বয়োজেষ্ঠদের নাকি এই উদ্যোগের সমর্থন ছিল না । তাঁদের মত অনুযায়ী বই মেলায় বিকোবার উপযুক্ত পণ্য নয় । যাইহোক মূলতঃ নবীন প্রকাশকদের উদ্যোগে গোটা পঞ্চাশ স্টল বই মেলার যাত্রা শুরু হয় ।

৮২ সালের সপ্তম বইমেলা কিন্তু রীতিমত জমজমাট ছিল । জীবনের সেই পর্যায়ে বেশী বই কেনার সামর্থ্য ছিল না । অল্প কয়েকটি বই সংগ্রহ করেছিলাম কেবল । কিন্তু সেই কঘন্টার আমেজটা স্মৃতিতে আজও অমলিন ।

তারপর থেকে শুরু ভবঘুরে জীবনের । কলকাতায় বইমেলার সময়ে সেভাবে থাকা হয়ে ওঠেনি । অবশেষে গতবছর সুযোগ এলো ।

১৯৯৫ সালে ক্রস উইন্ডস এর একটি গান বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল । অনেকটাই মনে হয় গানের মন ছোঁওয়া বাস্তবধর্মী কথার জন্য :

''পৃথিবীটা নাকি ছোট হতে হতে
স্যাটেলাইট আর কেবলের হাতে
ড্রইংরুমে রাখা বোকা বাক্সতে বন্দী
. . .
ঘরে বসে সারা দুনিয়ার সাথে
যোগাযোগ আজ হাতের মুঠোতে
ঘুচে গেছে কাল সীমানার গন্ডী ।''

৯৫ সবে বিশ্বায়নের শুরুর দিকের সময় । পরবর্তী সিকি শতাব্দীতে যে কত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তন হয়ে গেছে যাদের ৯০-এর দশক বা তার পরে জন্ম তারা কল্পনাও করতে পারবে না । ইন্টারনেট তখন শৈশবে, স্মার্টফোনের অস্তিত্ব কল্পবিজ্ঞানেও সেভাবে ছিল না ।

তাই গত বছরের বইমেলাতে অবাক হয়ে পরিবর্তনগুলি লক্ষ্য করেছিলাম । নতুন প্রজন্মের ঝকঝকে ছেলেমেয়েদের দেখে তো আমার বেশ লাগল । এদের বিরুদ্ধে অনেকের অভিযোগ এরা বই পড়েনা, মেলাতে যায় খেতে আর সেল্‌ফি তুলতে । এই প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য বর্তমানে বিনোদনের সংজ্ঞাটাই বদলে গেছে । আমাদের কৈশোর যৌবনে বই পড়া বা হলে গিয়ে সিনেমা দেখা অবসর সময় কাটাবার অন্যতম উপায় ছিল । এখন বই-এর প্রতিযোগী অনেক । স্বাভাবিক কারণেই বর্তমান প্রজন্ম আর সেভাবে ছাপা বই পড়ছে না ।

মাঝের প্রায় চার দশকে মেলার চরিত্র অনেকটাই পাল্টে গেছে । স্থান পরিবর্তন হয়ে নতুন মেলাপ্রাঙ্গণ সল্টলেকের সেন্ট্রাল পার্কে । চার শতাধিক স্টল । প্রকাশকদের স্টলগুলির সাথে সাথে নানা ধরণের খাবারের ও হস্তশিল্পের স্টল । সব বয়সের মানুষ নানান সাজে উপস্থিত । সবাই হয়তো বইপোকা নয় । অনেকেই এসেছেন মেলার আমেজ উপভোগ করতে মুচমুচে শীতের বিকেলে ।

স্থান পরিবর্তন অনেকের পছন্দ নয় । আমার অবশ্য সুবিধেই হয়েছে । রাজারহাটের ফ্ল্যাট থেকে টুক করে একটা উবের ধরে করুণাময়ীতে পৌঁছে যাওয়া । তাছাড়া ময়দানের তুলনায় ধুলো ও কম । গতবারে এত ভাল লেগেছিল যে এবারও বইমেলার সময় চলে এসেছিলাম । ২৮ শে জানুয়ারী থেকে ৯ই ফেব্রুয়ারি চলেছিল মেলা — এর মধ্যে ছ বার গিয়েছিলাম ।

এবারের বাড়তি আকর্ষণ ছিল অস্ট্রেলিয়ার একটি স্টল । 'বাতায়ন' পত্রিকার সম্পাদিকা অনুশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে এবং কলকাতাস্থ অস্ট্রেলিয় কনসাল জেনেরাল অ্যান্ড্রু ফোর্ডের সহায়তায় এটি সম্ভব হয়েছিল । যতদূর জানি বুক ফেয়ার গিল্ডের সভাপতি ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায় মশায়ও স্টল পেতে সাহায্য করেছিলেন ।

যাইহোক স্টলটি ছিল অস্ট্রেলিয়ার প্রবাসী বাঙালিদের একটা 'ঠেক' । দশ ফুট বাই দশ ফুট জায়গায় গোটা তিনেক প্লাস্টিকের টুল আর একটা টেবিল । সেখানেই জমিয়ে আড্ডা আর খাওয়া দাওয়া । অনুশ্রী এবং আমি ছাড়াও নিয়মিতদের মধ্যে ছিলেন মেলবোর্নের বিশিষ্ট সাহিত্যিক ছন্দসী বন্দ্যোপাধ্যায়, আর এক ক্যানবেরাবাসী ঘনিষ্ঠ বন্ধু মিলন ভট্টাচার্য, এবং সিডনির কবি সঞ্জয় চক্রবর্তী । এছাড়া রোজই আসতেন 'বাতায়ন' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত মানস ঘোষ, সুব্রত মিত্র ও অন্যান্যরা এবং সিডনির 'আনন্দধারা' র কলকাতার কর্ণধার তথাগত মুখোপাধ্যায় এবং আরো কয়েকজন । থেকে থেকেই 'চলুন একটু চা খেয়ে আসা যাক' বলে মিলন বাবুর সঙ্গে স্টলের পিছনে গৌতম টি স্টলে ভাঁড়ে খেয়ে আসতুম । (বঙ্গালি লোগ সব কুছ খাতা হায়, কুছ নেহি পিতা !) এই ভাঁড়ে চায়ের সঙ্গে যে যৌবনের অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে !

কনসুল জেনেরাল অ্যান্ড্রু ফোর্ড দুবার এসেছিলেন সপরিবারে এবং সবান্ধবে । সঞ্জয়ের কাব্যগ্রন্থ 'মেঘযাপন' লঞ্চ করলেন । একবার বেশ মজা হয়েছিল । সদ্য শাড়ি ধরা কয়েকটি কিশোরী অ্যান্ড্রুর সঙ্গে ছবি তুলতে চাইল । অস্ট্রেলিয়রা আমোদপ্রিয় মানুষ — হাসিমুখে একঝাঁক কিশোরীর সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়লেন । মহানন্দে ঝর্ণার মত কলকল করতে করতে মেয়েগুলি চলে গেল ।

আমাদের আগের প্রজন্ম গুলিতে যাটোর্ধ অবসর নেওয়া মানুষদের জীবন বেশ অন্যরকম ছিল । সময় কাটত পুজো আচ্চা, আশেপাশের বন্ধুদের সঙ্গে গল্প গুজব করে, বই পত্রপত্রিকা পড়ে, বা নাতি নাতনিদের দেখভাল করে । জমানা বদল গয়া । এই 'আপনা আপনা' দুনিয়াতে নাতি নাতনি বিরল । থাকলেও তারা থাকে ভারতের অন্য রাজ্যে বা বিদেশে । তবে বিনোদনের মাধ্যমে এবং ব্যাপ্তি নিঃসঙ্গতা অনেকটাই ঘুচিয়ে দিয়েছে । জীবন জুড়ে বসেছে ফেসবুক ও ওয়াটসঅ্যাপ । সারাদিন চলছে গুলতানি । হাজার হাজার ভার্চুয়াল বন্ধু । এই মধ্য ষাটের বেকার প্রতিবেদকটির এই মুহূর্তে সাড়ে তিন হাজার 'বন্ধু' । কয়েকজন সেলিব্রিটি — অধিকাংশই দেশে বিদেশে ছড়িয়ে থাকা সাধারণ মানুষ, যাঁদের বয়সের ব্যাপ্তি আঠারো থেকে আশি । কলকাতায় এসেছি শুনে অনেকেই দেখা করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন । বলে দিয়েছিলাম অস্ট্রেলিয়ার স্টলে চলে আসতে । কম করে কুড়ি জনের সঙ্গে সামনা সামনি আলাপ হল । বড় ভাল লাগল ।

৮২ সালে কবি সাহিত্যিকরা অনেক দূরের মানুষ ছিলেন। অন্তত আমার অভিজ্ঞতা তাই বলে। এবারের বইমেলাতে দেখলাম অনেকি উপস্থিত। মানুষের সঙ্গে হাসিমুখে আলাপ করছেন — গল্প করছেন। কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে ফেসবুকে আলাপ ছিল, ফোনেও বার কয়েক কথা হয়েছে। চিনতে পেরে হাসিমুখে বললেন ''কবে এলেন সিদ্ধার্থদা ?'' আলাপ হল স্বপ্নময় চক্রবর্তী, অমর মিত্র, নবকুমার বসুর সঙ্গে। 'মিত্র ও ঘোষে'র স্টলে পরিচয় হল নবীন সাহিত্যিক বিনোদ ঘোষাল, প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী ভূমি ব্যান্ডের সৌমিত্র রায় এবং ত্রিপুরার রাজ্যপাল তথাগত রায়ের সঙ্গে। একটা বড় প্রাপ্তি বইপাড়ার প্রবাদপুরুষ সবিতেন্দ্রনাথ রায়ের (ভানু বাবুর) সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ একান্তে আলাপচারিতার সুযোগ। (যাঁরা জানেন না, ওনার তিন খন্ডে 'কলেজ স্ট্রীটে সত্তর বছর' বাঙলা সাহিত্যপ্রেমীদের জন্য একটি অত্যন্ত সুখপাঠ্য স্মৃতিচারণ।) একটি সাহিত্যসভায় আমন্ত্রিত ছিলাম — সেখানে প্রধান অতিথি ছিলেন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। পূর্ব পরিচয় ছিল — অগুন্তি গুণগ্রাহীদের ভিড়ের মাঝে বললেন ''খুব ঘুরে বেড়াচ্ছ। উনি এখন একজন জীবিত কিংবদন্তি (Living legend) কলকাতায় এলে অযথা বাড়িতে গিয়ে বিরক্ত করি না। ঐ সভাতেই উপস্থিত ছিলেন পান্ডব গোয়েন্দা স্রষ্টা প্রবীণ সাহিত্যিক ষষ্ঠীব্রত চট্টোপাধ্যায়। আলাপ করলাম, অটোগ্রাফ নিলাম।

শুনি মানুষ আর বই কেনেনা। কিন্তু বিভিন্ন সময়ে বেশ কয়েকবার চেষ্টা করেও আনন্দ বা দেজের স্টলে ভীড়ের জন্য ঢুকতে পারলাম না। বিভিন্ন আলোচনা সভাতেও আগে ভাগে আসন সংরক্ষণ না করা থাকলে ঢোকা অসম্ভব। সাহিত্য বিষয়ক গুরুগম্ভীর আলোচনা মানুষ মন দিয়ে শুনছেন। বাঙালির সংস্কৃতিমনস্কতা দেখে একজন সাধারণ বাঙালি হিসাবে বেশ গর্ব হচ্ছিল। নানা দোষ ত্রুটি, অর্থনৈতিক সমস্যা সত্ত্বেও আমরা অন্যরকম।

মেলার পরিচালনা নিয়ে কিছু বলার আছে। গত বছর মেলার ফুট প্রিন্ট ছিল ২১ লক্ষ। এবারে মনে হয় সুন্দর আবহাওয়ার জন্য আরো বেশী। এত ভীড় সত্ত্বেও (শনি রবিবার সন্ধ্যার দিকে হাঁটা মুশকিল ছিল) মোটামুটি সুষ্ঠভাবেই মেলা চলেছে। খুব ভাল লাগল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাথরুম দেখে। অসুস্থ মানুষদের জন্য চিকিৎসা কেন্দ্র ছিল, আইন শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য অনেক পুলিশ। প্যাকেটে করে বিনামূল্যে পানীয় জলের ব্যবস্থা মেলার বাইরে সুন্দরভাবে যানবাহন নিয়ন্ত্রণ এবং পথচারীদের রাস্তা পার হবার ব্যবস্থা করছেন রক্ষীবাহিনী। সব মিলিয়ে একটি আন্তর্জাতিক মেলার উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা। উদ্যাক্তাদের অবশ্যই অভিনন্দন প্রাপ্য।

মেলা প্রাঙ্গনে ধূমপান নিষিদ্ধ ছিল। এরই মধ্যে এক কোণের দিকে তিন শাড়ি পরা যুবতী সদর্পে সিগারেট খাচ্ছে। একটু বিরক্ত লাগলেও ভাবলাম ''এই তো যৌবনের ধর্ম।'' প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে খড়গপুর আই আই টির ওপেন এয়ার থিয়েটারে গান বাজনা শুনতে শুনতে গঞ্জিকা সেবনের কথা মনে পড়ে গেল। আপন মনেই হাসলাম।

৯ই ফেব্রুয়ারী মেলার শেষদিন উপস্থিত ছিলাম। পুজো শেষের মত মন খারাপ লাগছিল। আশা করি আসছে বছর আবার হবে।

সিদ্ধার্থ দে — আই আই টি খড়গপুরের মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিঙের স্নাতক। স্নাতোকত্তর পড়াশুনা আমেরিকার ইউনিভার্সিটি অফ নিউ হ্যানপশায়ারে। ১৯৯০ সাল থেকে পাকাপাকি ভাবে অস্ট্রেলিয়াতে। দীর্ঘদিন ক্যানবেরা নিবাসী। ২০১৫-তে কর্মজীবন শেষ করে আপাতত সাহিত্য চর্চা, ভ্রমণ, টুকটাক লেখালেখি নিয়ে আছি। আর হ্যাঁ — ফেসবুকে, ওয়াটস্অ্যাপে ইত্যাদি সামাজিক মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে ছড়ানো বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডাও জীবনের একটা বড় অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে হালে। আমার মূলত ব্লগধর্মী কিছু লেখা desidd.wordpress.com সাইটটিতে সংকলিত করেছি।

আশ্রয়

“বর্ষ হয়ে এলো শেষ
দিন হয়ে এলো সমাপন
গাহিতে চাহিছে হিয়া
পুরাতন ক্লান্ত বর্ষের সর্বশেষ গান”

শুভ নববর্ষ ১৪২৭